'কিংবদন্তীর দেশে' : ইতিহাসে উপেক্ষিত

'গল্প সৃষ্টি করা যেমন মানুষের অন্তরের স্বভাবধর্ম, তেমনি গল্প শোনাও অন্তরের স্বভাবজাত ক্ষুধা বিশেষ।" - এই উক্তিটি স্বয়ং সুবোধ ঘোষ তাঁর 'কিংবদন্তী প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে বলেছিলেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম কাহিনিগুলি আজ অবলুপ্ত, তবু জগতের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত নিজস্ব গল্পকথার মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কথা সাহিত্যের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে মানব ইতিহাসের একেবারে প্রথম পাতা মেলে ধরলে দেখা যায়, সেখানে আদমের মাটি কোপানো এবং ইভের কাপড় বোনা শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যার অবসরে যে গল্প করত সন্তানদের কাছে তা মূলত লোককথারই রূপ। পরিবেশ, জীবনযাত্রা এবং আনন্দলাভের প্রয়োজনে সব দেশের মানুষই একভাবে গল্প ভাবতে শিখেছে। এই প্রথম ধাপে রয়েছে নীতিশিক্ষা আর রূপকথা। রূপকথার যথার্থ বিকাশ ঘটে মানব ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে। একদিকে শিশুমহলে, অন্যদিকে বয়স্কদের আসরে গিয়ে রূপকথা নবতর সার্থকতা পেল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন - "আরো জীবননিষ্ঠ, বস্তু সংপৃক্ত এবং মানবতার আবেদনে মন্ডিত হয়ে এই রূপকথাই মধ্যযুগীয় রোমান্সের তীব্র নিখাদে ঝঙ্কার তুলল।"[১] প্রেম, বীরত্ব আর নিয়তির পৌরাণিক কাহিনিগুলিকে নতুন রূপ দেওয়া হল রোমান্সে। রোমান্সের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - " Romances in verse (and to start with most of theme were in verse) were works of fiction, or non-historical. In the 13th ca. romance was almost any sort of adventure story, be it of Chivalry or of love."[২] রোমান্সের বিষয় কি হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলা হয়েছে - "This suggests elements of fantasy, improbability, extravagance and naivety. It also suggests elements of love, adventure, the marvellous and the 'mythic'."[৩] সাধারণত রোমান্স এর সঙ্গে ইংরাজী ও ফরাসী ব্যালাড এর কিছু সাদৃশ্য রয়েছে - "The ballad poet drew his materials from community life, from local and national history, from legend and folklore. His tales are usually of adventure, war, love, death and the supernatural."[৪] ব্যালাড বা গাথা মূলত লোকসংস্কৃতির বা লোকজীবনের গাথা বা আখ্যান। বাংলা সাহিত্যে ব্যালাড বা গীতিকার সার্থকতম নির্দশন মৈমন সিংহ গীতিকা', যেগুলি গ্রাম্য কৃষকের মুখে শোনা। মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি গাথাগুলির প্রায় প্রতিটিই বাংলাদেশের নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, হালিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের নারীচরিত্রের প্রেমের দুর্জয় শক্তি, আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্তভাবে দেখানো হয়েছে। গীতিকাগুলির মধ্যে যেখানে ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে সেখানে আজগুবি বিষয় নেই, কিন্তু অন্যান্য গীতিকাগুলিতে আজগুবি ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়।

একইভাবে স্থানিক ঘটনা, স্থানিক নদী-দীঘি-অরণ্য-পাহাড় ও জলকুণ্ড অথবা শ্মশানভূমিকে প্রসঙ্গ করে বহু কাহিনি সৃষ্টি হয়েছে। এক একটি দেশ ও জাতির ইতিহাসের সমস্ত ঘটনার একটি অশরীরী রূপ জীবন্ত করে রাখে কিংবদন্তী। 'কিংবদন্তী' শব্দের আক্ষরিক অর্থ জনশ্রুতি, জনরব বা গুজব। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই এক একটি কিংবদন্তীর দেশ আছে। এই দেশ নিছক কল্পনাসম্ভব কোন দেশ নয়, কিংবদন্তী জাতির বিশেষ এক শ্রেণীর কথা। সাধারণ মানুষের কল্পনাভূমিতে সাধারণ মানুষেরই ভাবনা ও আগ্রহের রূপ বিকশিত করেছে কিংবদন্তী। বাংলা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষ 'কিংবদন্তীর দেশে' নামক একটি সাহিত্য শাখা গড়ে তোলেন। যেগুলির মধ্যে পাঠক মূলত ছোট গল্পের আস্বাদ পেয়ে থাকে।

সুবোধ ঘোষ 'ভূমিকা' অংশে কিংবদন্তীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন - "জনসমাজে মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনি মাত্রকেই কিংবদন্তী বলা ঠিক হবে না। ঐতিহাসিক অথবা প্রাকৃতিক কোন বাস্তব নিদর্শনকে আশ্রয় ক'রে যে কাহিনি জনমনের কোন কল্পনায় রূপ গ্রহণ করে, সেই কাহিনিকেই যথার্থ কিংবদন্তী বলা যায়।" (৭পৃ.) - ইতিহাসকে আশ্রয় করে, কখনো বা ইতিহাসকেই মুখ্য করে উপন্যাস গল্প রচিত হয়েছে কথাসাহিত্যের সূত্রপাতের সময় থেকেই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ সেই ধারাতেই রচনা করে গেছেন উপন্যাস ও গল্প। ইতিহাসের ছোটসময় ও বড়সময়ের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন ঘটিয়ে ইতিহাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ব্যাথাতুর হৃদয়ের অশ্রুসিক্ত কাহিনিকে সুবোধ ঘোষ তুলে আনেন 'কিংবদন্তীর দেশে' নামক রচনায়। যেখানে লিখিত ইতিহাস চুপ করে থাকে, সেখানে কিংবদন্তী মুখর হয়ে ওঠে। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক - গঠনগত দিক থেকে এই দুই শ্রেণীর কিংবদন্তী রয়েছে। পৌরাণিক কিংবদন্তীর ক্ষেত্রে পৌরাণিক কাহিনির সূত্র ধরে স্বাধীনভাবে কল্পনার ক্ষেত্র রচনা করতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক কিংবদন্তী হলো বাস্তব নিদর্শনকে অবলম্বন ক'রে কল্পনার আত্মপ্রকাশ, কল্পনাকে কোন বাস্তব নিদর্শনের ওপর আরোপ করা নয়। ঐতিহাসিক তথ্য মানুষকে সত্য জানতে সাহায্য করলেও মানুষের মনের অদম্য কৌতূহল মেটাতে সক্ষম হয় এইসব কিংবদন্তী। কারণ - "মানুষের নির্জ্ঞান মনের গভীরে যেন সেই আদিকালের মানুষের এক শিশু কৌতূহল আজও লুকিয়ে রয়েছে।... বহু কিংবদন্তী এইরকম শিশু কৌতূহলের সহজ প্রকাশ।" (পৃ.১২) ইতিহাস এবং ঘটনাকে প্রশ্ন করে বিচারকের মত রায় দান করে কিংবদন্তী। এখানেই কিংবদন্তী সাহিত্য পদবাচ্য। কারণ ইতিহাসের বড় সময় ও ছোট সময়ের মাঝে ব্যক্তিগত সময়ের কারবারি প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যিকেরা। কিংবদন্তী অতীত ইতিহাসের সেইসব কাহিনিকে তুলে ধরার চেষ্টা করে, কালের নিয়মে যে ইতিহাস ঘাসে ঢাকা পড়েছে বা যে ইতিহাসের চরিত্ররাও তাদের ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ জ্বেলে রেখেছে। সুবোধ ঘোষ সেই চাপা পড়ে যাওয়া ইতিহাস থেকে ঐতিহাসিক কিংবদন্তী রচনা করেন Romantic exotic feeling বা সুদূরের প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ থেকেই।

ইতিহাসের তথ্য অনুসন্ধানের চাইতে তাঁর মূল প্রবণতা ইতিহাসের তথ্যের গভীরে ডুব দিয়ে নর-নারীর প্রেমের সম্পর্ক ও চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলা। একই রকম চিন্তা চেতনার জায়গা থেকে তিনি একসময় মহাকাব্যের গভীরে ডুব দিয়ে 'ভারত প্রেমকথা' রচনায় তুলে আনতে চেয়েছিলেন মহাকাব্যের প্রাচীনতার আড়াল থেকে জীবন্ত মানুষগুলিকে। এই রোমান্সধর্মী রচনার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের কাল থেকেই। তিনি ইতিহাসের সঙ্গে রোমান্স ও কল্পনার খাদ মিশিয়ে উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন। 'কপাল কুন্ডলা' উপন্যাসটির উৎসও মূলত জনশ্রুতি ও জনরব। জলপাইগুড়ি জেলার একটি কাহিনিকে কেন্দ্র করে নবকুমার কপালকুণ্ডলার নাটকীয় ঘটনার মধ্যে প্রায় জোর করে ইতিহাসের চরিত্র মতিবিবির উপস্থিতি এবং সেই সূত্রে খানিকটা ইতিহাস উপন্যাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। পরবর্তীকালে 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'সীতারাম' প্রভৃতি উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে রোমান্সধর্মী ঘটনার অবতারণা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিম পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্র দত্ত 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' নামক দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর গতি কাল্পনিকতা থেকে সত্যনিষ্ঠার দিকে ধাবিত হয়েছে। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা তাঁর সত্যনিষ্ঠা অনেক বেশী। তাঁর উপন্যাস দুটি মূলত ইতিহাসের সংশয়হীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের রহস্যসন্ধানী লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রাণিত হয়ে ঐতিহাসিক গল্প উপন্যাস লিখেছেন। ইতিহাস থেকে চরিত্র সংগ্রহ করে গল্প বানিয়েছেন লেখক স্বয়ং। 'অমিতাভ', 'চুয়াচন্দন', 'তক্তমোবারক', 'শঙ্খ-কঙ্কণ', 'মৃৎপ্রদীপ', 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', 'গৌড়মল্লার', 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' প্রভৃতি রচনায় তিনি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ''বাঙালীকে তাহার প্রাচীন tradition এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেওয়া।'' 'চুয়াচন্দন' চৈতন্যদেবের আমলে নদীয়ার একটি কাহিনি। চৈতন্যদেবের কৈশোর জীবনের ঘটনা তাঁর গতানুগতিক চিত্রকে ছাপিয়ে গিয়েছে এই কাহিনিতে। 'তক্ত মোবারক' গল্পে সুজার ঐতিহাসিক কাহিনির মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করা হলেও মোবারক ও পরীবানুর রোমান্সই ছিল মূল লক্ষ্য। 'অষ্টম সর্গ' গল্পে কুমারসম্ভবের কবি কালিদাসের জীবনকে কেন্দ্র করে এক প্রচলিত কিংবদন্তীকে রূপ দেওয়া হয়েছে। 'মৃৎপ্রদীপ' এর আখ্যান বস্তু সম্পূর্ণ কাল্পনিক। চরিত্রের নামগুলি ঐতিহাসিক হলেও তৎকালিন আবহাওয়ায় গড়ে তোলেন গল্পটি। এ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য - ''কুমরাহারে প্রাচীন পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর সময় জঞ্জালস্তূপের মাঝে একটি মাটির প্রদীপ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। মুখের কাছে একটু যেন পোড়া দাগ লেগে রয়েছে। খননকারীরা হয়তো এটা ফেলে গেছেন কিম্বা তাঁদের নজরে আসেনি। সেটা কুড়িয়ে এনে বাড়িতে টেবিলের উপর রেখে দিলাম এবং রাত্রে সেটি জ্বাললাম। কয়েকদিন ওই জ্বলন্ত প্রদীপটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে 'মৃৎপ্রদীপ' গল্পটি মাথায় আসে।''[৫] - জন্মান্তরের সাহায্য নিয়ে এই ধরণের ঐতিহাসিক কাহিনি রচনা মূলত কিংবদন্তীরই নামান্তর। একই ধারায় সুবোধ ঘোষ স্বতন্ত্র technic

এর সাহায্যে রচনা করলেন 'কিংবদন্তীর দেশে'। সুপান্থ ছদ্মনামে রচিত ত্রিশটি ঐতিহাসিক কিংবদন্তী যেন ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস ও নানা প্রান্ত থেকে কুড়িয়ে পাওয়া এক একটি মৃৎপ্রদীপ।

সেনাপতি লাউসেন এর সঙ্গে রাজকন্যা কানেড়ার মিলন কাহিনি রচিত হয়েছে 'কহ কৌশিকী'র পাতায়। হিন্দুসমাজে ধর্মঠাকুরের পূজা-প্রবর্তন প্রসঙ্গে ময়নাগড়ের লাউসেনের নাম জড়িত আছে। রাজা হরিপালের কন্যা কানেড়ার পাণিপ্রার্থনা করে দূত পাঠিয়েছিলেন গৌড়েশ্বর ধর্মপাল। ইতিহাসে ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ পর্যন্ত ধর্মপালের রাজত্বের বর্ণনা পাওয়া যায়।[৬] গৌড়েশ্বরের সশস্ত্র অহংকারকে প্রত্যাখ্যান করে রাজকুমারী কানেড়া বৃদ্ধ ধর্মপালের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারেনি। কৌশিকীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন অথবা অরাতিবাহিনীর অস্ত্রঘটার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া এ দুই এর মধ্যে কোন্‌টি পরম উপায়, বিবেচনা করতে গিয়ে কানেড়া সিদ্ধান্ত নেয় যুদ্ধে অংশ নেওয়াই একমাত্র পথ। এই যুদ্ধে গৌড়েশ্বরের সেনাপতি লাউসেনকে দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় কানেড়া। মনে মনে সেনাপতি লাউসেনকে বরমাল্য দান করে, কিন্তু তার কল্পনাকে চূর্ণ করে হৃদয়হীন সেনাপতি লাউসেনের নির্দেশমত তাকে বন্দী করা হয়। বন্দিনী কানেড়া এই অপমানের হাত থেকে নিস্কৃতি পেতে কৌশিকীর জলে ঝাঁপ দেবার সুযোগ খুঁজলেও তাকে সে সুযোগ দেওয়া হয় না। বরং বন্দিনী নারীকে বিস্মিত করে নিয়ে আসা হয় চিত্রশালায়। উৎসবের সাজে সজ্জিত চিত্রশালায় প্রবেশ করে কানেড়া লজ্জিত হয়। নীরবে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে তারই প্রতিকৃতিতে রক্তপলাশের মালা দুলছে, যে রক্তপলাশ লাউসেনের কণ্ঠের মণিহার। তারপর বন্দিনী কানেড়াকে মুক্ত করে কোন এক শুভলগ্নে উভয়ের মিলন সাঙ্গ হল। নবম শতাব্দীর ইতিহাসে এই আনন্দঘন মিলনের একমাত্র সাক্ষী কৌশিকী, আজ তার ভাষা পঙ্কভারে মূক হয়ে গেছে। কিন্তু তার দুই তীরে বন্দীপুর ও চিত্রশালী গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাসের ঐ নামগুলি। লাউসেন-কানেড়ার মিলনের পূর্বে জীবনের দুঃসহ রাত্রির আক্ষেপ ও বেদনার কথা বলতে পারে একমাত্র কৌশিকী, কারণ কৌশিকীর তরঙ্গভঙ্গিমার কাছেই কানেড়া নিবেদন করেছে তার হৃদয়ের প্রেমতৃষ্ণা ও আনন্দ বেদনার কথা। তাদের মিলনের পরেও এই কৌশিকীই দেখেছে নারীর প্রণয়রাগে রঞ্জিত হয়ে রণক্ষুব্ধ একটি অপরাহ্ন কি নির্মল আর শান্ত রূপ ধারণ করে।

দশম শতাব্দীতে পাল বংশের প্রথম মহীপালের ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রেখেছে আরো এক কিংবদন্তী 'মহীপালের দীঘি'। পাল বংশের লুপ্ত গৌরব খানিকটা ফিরিয়ে এনেছিলেন মহীপাল। সেজন্যেই বাঙ্গালীর লোকস্মৃতি মহীপালের গানে মহীপালকে ধারণ করে রেখেছে।[৭] দিনাজপুর জেলার মহীপাল দীঘি এই রাজার স্মৃতিকে বহন করে চলেছে। ইতিহাসে লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে এনে যে রাজার নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হয়েছে তার নেপথ্যে লুকিয়ে থাকা নারীর অবদানকে একমাত্র মূল্য দিয়েছে কিংবদন্তী। 'মহীপালের দীঘি' গল্পে মহীপালের ঔদ্ধত্যকে, রাজার রাজোচিত মর্যাদাকে স্মরণ করিয়ে দেয় লীলা। পাল বংশের

উত্তরাধিকারী গৌড়ের বৌদ্ধ অধিপতি মহীপালের প্রমোদময় জীবনের স্বপ্নকে চূর্ণ করে দেয় লীলার প্রেম। বর্ধমান পুরীর শ্রেষ্ঠী বিজয়মাধবের সঙ্গে বিবাহের আয়োজন হয়েছে লীলার। কিন্তু লীলা স্বামী হিসাবে মনে মনে বরণ করে নিয়েছে মহীপালকে। লীলার রূপ লাবণ্যে মহীপালও তার প্রতি আসক্ত, কিন্তু নারীকে শুধু প্রমোদ ভবনের সঙ্গী করতে অভ্যস্ত রাজার ঔদ্ধত্যকে প্রতিবাদ করে - "রাজ গৌরব হারিয়েছেন যে রাজা, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে আমার মত দীনাহীনাও গর্ব অনুভব করতে পারে না।"(পৃ.৪৯২) স্বাধিকার অর্জনে সচেতন লীলার গর্বিত বাক্যে মহীপাল তাঁর তরবারি তুলে নিতে সক্ষম হয়েছেন। পুনরুদ্ধার করেছেন বরেন্দ্রভূমি, প্রতিষ্ঠা করেছেন পাল রাজগৌরব। নারীর প্রেম তাঁর পুরুষকারকে জাগিয়ে তুলেছে, তাইতো তাঁর জীবন থেকে বাদ দিতে পারেননি লীলাকে। প্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার চিহ্ন রূপে তিনি তাঁদের প্রথম মিলনের স্থানটিতে খনন করেন একটি দীঘি। কথিত আছে এই দীঘিতে স্নান করতে এসেই লীলা ফিরে পায় তার প্রেমিকের সত্যকার হৃদয়টি, যে হৃদয়ে প্রমোদের আনন্দ নয়, লুকিয়ে ছিল প্রেমিকের মুগ্ধ দৃষ্টি।

পালবংশের মহীপালের পর গণেশের পুত্র যদু জালালদ্দিন ও পুত্রবধূ আসমানতারার ইতিহাসকে তথ্য হিসাবে গ্রহণ করে সুবোধ ঘোষ রচনা করেন 'ফুলজানি নামা'। লিখিত ইতিহাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ঐতিহাসিক চরিত্রের দুফোঁটা অশ্রুবিন্দুকে মূল্য দেয় যে কিংবদন্তী সেই জনশ্রুতিকেই গল্পের মোড়কে রূপদান করেছেন তিনি। ১৪১৪-১৫ খ্রীঃ শেষ দিকে গণেশ আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং নিজের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে মুসলমান রাজত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে স্বয়ং বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ বিধর্মীয় সিংহাসন অধিকারে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে থাকে। রাজা গণেশ কঠোরভাবে এই বিরোধিতা দমন করলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র রাজনীতিচতুর যদু পিতার পক্ষ ত্যাগ করে ইব্রাহিমের পক্ষে যোগ দিলেন। রাজ্যের লোভে নিজের ধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে মুসলিম হয়ে বাংলার সিংহাসনে বসলেন। তাঁর পরিচয় হল - জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ। কিছুদিন পর গণেশ সুযোগ বুঝে পুত্রকে অপসারিত করে স্বয়ং দনুজমর্দনদেব নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই পুত্রকে হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করেছেন।[৮] গৌড় মসনদের রাজা গণেশ এবং পুত্র যদু দত্তের ইসলামধর্মে দীক্ষিত হবার ইতিহাস আমরা জানি, আমরা যা জানিনা তা হল ইলিয়াসশাহী বংশের কন্যা ফুলজানি বেগমের আসমানতারা হবার কাহিনি, আমরা জানিনা কোন্ বেদনা আর অতৃপ্তি নিয়ে পাণ্ডুয়ার একলাখী মসজিদের ভিতরে তিনটি সমাধিতে শয়ান আছেন যদু-জালালউদ্দিন, তাঁর পত্নী আসমানতারা এবং পুত্র আহমদ শাহ।(১৪১৮-১৪৩৩ খ্রীঃ) সুলতান জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের কন্যা আসমানতারাকে বিয়ে করেছিলেন-ইতিহাস এই তথ্যের সন্ধান দেয়। আসমানতারার জবানিতে তাঁর আত্মকথা ফুলজানি নামায় ইতিহাসের অন্তঃপুরের সেই বেদনার ফল্গুধারা

প্রবাহিত। ইলিয়াস শাহী বংশের মেয়ে ফুলজানি বেগম রাজা গণেশ দত্তের পুত্র যদুর প্রতি আকৃষ্ট হন তাঁর প্রকৃত পরিচয় না জেনেই। তিনি হিন্দু যদু দত্তের স্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখেন, কিন্তু পিতার কথা মনে রেখেই মসনদের হিসাব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। যদু দত্তের মনের শান্তি যেন বিঘ্নিত হতে থাকে। জালালুদ্দিনের পুনর্বার হিন্দুত্ব গ্রহণ মেনে নিতে পারে না হিন্দু সমাজের শাস্ত্রীরা। যদু মসনদের মোহ পরিত্যাগ করে স্ত্রী পুত্র নিয়ে চলে যাবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু বাস্তবের কঠিন সংস্পর্শে এসে আসমানতারার সমস্ত কল্পনার অবসান ঘটে। তাঁর পুত্র আহমদ শাহ একদিন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবে, এ লোভ সংবরণ করা সম্ভব হয় না তাঁর পক্ষে। মসনদের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিতেই তাঁর জীবন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। যদু'র মৃত্যু হয়, নাসিরুদ্দিনের তরবারির আঘাতে গৌড়ের সিংহাসন শোণিতধারায় লিপ্ত হয়, বন্দী হয় আহম্মদ শাহ। আসমানতারার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। মনে পড়ে যায় পিতার উপদেশ। প্রেমিকের প্রতি ভালোবাসায় গড়তে চেয়েছেন যে সুখের নীড়, তারই ফাঁকে এসে বাসা বেঁধেছে লোভ নামক রিপু। অন্তরের এই ফাঁক ধরতে পেরেই আসমানতারা স্বামীর শেষ ইচ্ছাটুকু পুরণের জন্য হিন্দু বিধবা বেশে শ্বশুর গণেশ দত্তের পিতৃপুরুষের ভিটায় শেষজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁরই ইচ্ছানুসারে স্বামীপুত্রের কবরের পাশে মৃত্যুর পর তাঁকে কবর দেওয়া হয়। নাসিরুদ্দিন শাহের গৌড় আক্রমণে গৌড়ের মসনদ যে রক্তাক্ত হয়েছে সে ইতিহাস পুথির পাতায় আজও স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে, কিন্তু কোন ইতিহাস লেখেনি আসমানতারা ও যদুদত্তের ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার গোপন কাহিনি। শুধু গৌড়ে একলাখী মসজিদের পাশাপাশি তিনটি কবর সেই ব্যর্থতার কাহিনিকে ধারণ করে রয়েছে।

তিনশো বছর মুসলমান অধিকার ও শাসনের অত্যাচারে হিন্দুরা উৎপীড়িত হয়। সেই সময় বলপূর্বক হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, হিন্দুর দেব-দেউল ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। সুলতান হুসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯) এই অত্যাচার পূর্ণমাত্রা নিয়েছিল। ১৪৮৫ খ্রীঃ এক মহালগ্নে আর্বিভূত হলেন চৈতন্যদেব।[৯] তাঁর আবির্ভাব হিন্দুসমাজের কাছে এক বৈপ্লবিক ঘটনা। সাম্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর ধর্মে জাতিভেদ ছিল না। জাতিভেদ প্রথাই হিন্দুসমাজকে অবক্ষয়ের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। চৈতন্যদেব প্রচার করেছেন যে এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের কোন বিভেদ নেই। চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্ম আন্দোলনেই ধর্মান্তরিতকরণের স্রোত বিপরীতগামী হয়ে মুসলমানকেও চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তাইতো যবন হরিদাসও ভক্ত হরিদাসে পরিণত হতে পারেন। আবার পাহাড় প্রতিম বীর হাম্বীরও মূর্ছিত হন চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ শ্রবণ করে। 'লও ফিরে তব পুরস্কার' নামক গল্পে যবন হরিদাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কিংবদন্তী রূপ লাভ করেছে। বেনাপোল অঞ্চলের ভূস্বামী রামচন্দ্র খানের বিষয় বৈভবের গর্বকে ধূলিসাৎ করে দেয় যবন হরিদাসের প্রেমভক্তি। হরিদাস ঠাকুরকে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়ে আর তিন লক্ষ নাম জপ করে দিনকয়েকের মধ্যে সকলের প্রিয় হয়ে উঠতে দেখে হিংসায় জ্বলে ওঠেন

রামচন্দ্র খান। তাঁর বিষয়বৈভবকে তুচ্ছ করে প্রজারা হরিদাস ঠাকুরের অঙ্গনে সমবেত হয়েছে। যে করেই হোক হরিদাস ঠাকুরের প্রজ্জ্বলিত প্রদীপটি নিভিয়ে দিতে হবে। নানা ছলনায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত এক বারাঙ্গনাকে আগাম পুরস্কার দিয়ে পাঠানো হয় হরিদাস ঠাকুরের নামজপ বন্ধ করে দিতে। কুটীরে প্রবেশ করে তুলসীমঞ্চের পাশে বসে হরিদাস ঠাকুরের জপমালার দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকে বারাঙ্গনা, "যেন কোটি সঙ্গীতের মধুরতার মধ্যে ডুব দিয়ে রয়েছে ঐ নীরব জপমালা।"(পৃ.৬৩) ভূস্বামী- রামচন্দ্রকে দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে বারাঙ্গনা নারী হরিদাস ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে শুচিতা ও শান্তি। হরিদাস ঠাকুরের জীবনের সকল শান্তিকেই কেড়ে নিতে এসে বারাঙ্গনা নারী এতদিনে পরাজিত হয়েছে। বারবার তার রূপের মোহে পুরুষ চিত্তের বিকার ঘটিয়েছে যে নারী, আজ হরিদাস ঠাকুরের নাম জপের মোহে আবিষ্ট হয়ে ভূস্বামীর সকল ষড়যন্ত্রকে মিথ্যে করে দিয়েছে। এমনকি রামচন্দ্র খানের দেওয়া আগাম অর্থমূল্য ফিরিয়ে দিয়ে বারাঙ্গনা ভূস্বামীর অহংকারকে চূর্ণ করে দিয়ে জয়ী করেছে যবন হরিদাসের ভক্তি-প্রেমকে।

রাজমহলের দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে তিনজন জমিদারের একজন ছিলেন মল্লভূম ও বাকুঁড়ার বীর হাম্বীর। তিনি মুখে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করলেও, কখনও সুবাদার ইসলাম খানের দরবারে উপস্থিত হতেন না।[১০] ১৫৯১-১৬১৬ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের বলিষ্ঠ বাহুর বহুকীর্তির স্মৃতি ধারণ করে আছে ঐ দুর্গের দুয়ার। 'মূর্ছা পাহাড়ের কথা' রচনায় বীর হাম্বীরের বহুকীর্তিরই একটি মাত্র বর্ণিত হয়েছে। দুর্বার এক লোভে রাজা বীর হাম্বীর রত্নে পরিপূর্ণ একটি পেটিকা লুণ্ঠন করেন। রাজজ্যোতিষীর কোষ্ঠীবিচারকে অনুসরণ করতে গিয়ে এই রত্ন পেটিকা নিয়েই তিনি প্রবেশ করেন দুর্গভবনে। কিন্তু রত্ন পেটিকার ডালা উন্মোচন করেই আক্ষেপ গর্জে উঠল রাজার কণ্ঠে। রত্নের পরিবর্তে কতগুলি পুথি রয়েছে ঐ পেটিকায়। পরদিন প্রত্যুষেই বীর হাম্বীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বৈষ্ণব শ্রীবিলাস। কারণ লুণ্ঠিত পুথিটি আসলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। আচমকা রত্নলুণ্ঠক হাম্বীরের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। রত্ন নয়, অমৃতের আস্বাদ নিতে লোভ হল হাম্বীরের। রাজভবনে পাঠ হল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। মিটে গেল তার রত্ন-তৃষ্ণার জ্বালা। এরপর যেদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পুথিটি শ্রীনিবাসের হাতে তুলে দেবার সময় হয় সেদিন বীর হাম্বীরের চোখে জল দেখা দেয়, তাই মুহূর্তেই তিনি তাঁর জীবনের সিদ্ধান্ত স্থির করে নেন - "ইন্দ্রোৎসবের সব হর্ষ-কলরব পিছনে ফেলে রেখে বীর হাম্বীর দু'হাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পুথি বুকের কাছে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে এই পাথর দরজা দিয়েই বের হয়ে যাচ্ছেন। আগে আগে চলেছেন আচার্য শ্রী নিবাস।"(৮৯-৯০পৃ.) প্রেমভক্তির এই অপরূপ পরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এই মূর্ছা পাহাড়। এটি সত্যি কোন পাহাড় নয়, প্রাচীন এক দুর্গপ্রাচীরের জীর্ণ দেহখণ্ড মাত্র। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের পাথরের বুকও চৈতন্যচরিতামৃতের রসাস্বাদনে মূর্ছিত হয়ে যায়, মূর্ছাপাহাড় নামটি সেই প্রতীকী

ব্যঞ্জনাই বহন করে।

ধর্ম মানুষকে ধারণ করে, কিন্তু ধর্মের নামে গোঁড়ামি মানুষকে নিয়ে যায় অন্ধকার অতল গহ্বরে। সেখান থেকে মুক্তির কোন পথ নেই। 'ভক্ত মর্তুজা' শীর্ষক রচনায় ফকির মর্তুজা ভক্ত মর্তুজাতে পরিণত হন। সৈয়দ হোসেন কাদরীর পুত্র মর্তুজা যুবক বয়সেই ফকিরী ধর্ম গ্রহণ করেন। সংসারের সকল বন্ধন হেলায় তুচ্ছ করে বেড়িয়ে পড়েন পথে। সাধনপথের কোন গণ্ডী স্বীকার করেন না মর্তুজা, এমনকি মন্দির মসজিদের ভেদও মানেন না তিনি। ব্যাকুল হয়ে শুধু সন্ধান করেন জীবনের তৃপ্তি আছে কোথায়? ভাগীরথীর তটে বসে তাঁর কণ্ঠে সঙ্গীতের সুর বেজে ওঠে। সেই সঙ্গীতের স্বরেই ব্রাহ্মণকন্যা আনন্দময়ী এসে দাঁড়ান মর্তুজার সামনে। তিনিও জীবনের মূল অর্থের সন্ধান করছেন। জীবনকে তাঁর মনে হয় নিরর্থক। মর্তুজাকে দেখতে পেয়ে, তাঁর সাধক জীবনকে জেনে আনন্দময়ীও সাধন পদ্ধতিকেই বেছে নিলেন। মর্তুজার সাধন পথের সঙ্গিনীর মন সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করতে পারেননি দেবতার পায়ে। তাই তাঁর মনে কল্পনায় দেবতা আসা যাওয়া করেন মর্তুজার মূর্তি ধরে। এই ঘটনায় লজ্জিত ও অনুতপ্ত আনন্দময়ী মর্তুজার সাধনপথ থেকে সরে গেলেন। মর্তুজাও অনুভব করেন তাঁর মনের মায়াময় ফাঁকি। ভাগবতের উচ্চারিত বাণী তাঁর হৃদয়কে প্লাবিত করে, তিনিও গোপীগণের মত কৃষ্ণপ্রেমে লীন হবার মন্ত্র পান। হৃদয়ের সমস্ত চাঞ্চল্য দূরীভূত হয়ে যায়। সেদিন একতারা হাতে আনন্দময়ীকে দেখতে পেয়েও মর্তুজার হৃদয় দুর্বল হয় না। আনন্দময়ীর অনুরাগও মর্তুজার জীবনে আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ তাঁদের অনুরাগ ব্যক্তিপ্রেমের উর্ধ্বে উঠে কৃষ্ণপ্রেমের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। দুজনের মিলিত কণ্ঠের মধুময় সঙ্গীত কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। কৃষ্ণের পদচ্ছায়া কামনা করে বিধর্মী মর্তুজা ভক্ত মর্তুজা হয়ে ওঠেন, ব্রাহ্মণকন্যা আনন্দময়ী যার চিরসাথী। চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি আন্দোলনের ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে সর্বধর্ম সমন্বয়ের চিত্র দেখা গিয়েছিল। প্রথম সমাজ সংস্কারক রূপে দেখতে পাওয়া যায় চৈতন্যদেবকে। তাঁরই আন্দোলনে প্রেমভক্তি যে মানবতার গভীরতর স্তরে পৌঁছে গেছে, কিংবদন্তীর এইসব ছোট ছোট গল্পগুলিতে তারই প্রমাণ মেলে।

ভারতবর্ষে মুসলিম আক্রমণই শুধু নয়, মুসলিমদের পর এদেশে এসেছে ইংরেজ, পর্তুগীজ ও ফরাসীরা। পর্তুগীজ ধর্মযাজকরা তাদের ধর্মকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে একসময় জোর করেই হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতে শুরু করে। মোগল বাদশাহ শা'জাহানের সাবধানবাণীকে উপেক্ষা করেও ধর্মযাজকেরা দেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করে। তাদেরই এক শ্রেণী যাজকেরা দাস বাজারের মাঠে এসে দাসদের মুক্তির লোভ দেখিয়ে নিজেদের ধর্ম দান করে। কিন্তু অন্য এক পর্তুগীজ ধর্মযাজক দাক্রুজ ধর্মের পথকে চিনলেন অন্যভাবে। 'ধার্মিক দাক্রুজ' নামক রচনায় সেই জনরবই রূপ লাভ করেছে। পর্তুগীজ উপনিবেশের এক ভয়ংকর ভুলকে সংশোধন করে দিতে এগিয়ে আসেন দাক্রুজ। ধর্মব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মুক্ত করেন দাসদের। দাসদের মুক্তি দিয়ে একবার শুধু তাঁর উপাস্য মেরী মাতার মূর্তির সৌন্দর্যের

কাছে এনে দাঁড় করান। এদিকে পর্তুগীজদের ওপর এবং ব্যাণ্ডেল গীর্জার ওপর আক্রমণ হানে মোগল সৈন্যের দল। মাতা মেরীর মূর্তি আঁকড়ে ধরে জলে ঝাঁপ দেয় দাক্রুজের সহচর এক ভৃত্য। বন্দী হন শতাধিক পর্তুগীজ। কিন্তু একমাত্র দাক্রুজকেই ক্ষমা করেছিলেন বাদশাহ শাজাহান। কারণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুক্তিলাভের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দাক্রুজ হাসিমুখে কঠিন শাস্তি গ্রহণের জন্য তৈরী হয়েছিলেন। শাজাহান দাক্রুজের ধর্মনিষ্ঠা ও আদর্শের প্রতি সম্মান দিতেই নতুন করে গীর্জা নির্মাণের অনুমতি দেন। দাক্রুজ গীর্জা নির্মাণ করেন, কিন্তু মেরী মাতার বেদিকা শূন্য। প্রার্থনা করেন দাক্রুজ "ফিরে এসো মাতা" (৫৪৮ পৃ.) - মাতা মেরীর প্রতি, স্বধর্মের প্রতি এমন ভক্তি ও নিষ্ঠায় প্রীত হয়ে দেখা দেয় ছায়ামূর্তি। জনরব রয়েছে যে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বা দাসকে দাক্রুজ মুক্ত করেছিলেন পর্তুগীজ বণিক এবং ক্রেতার হাত থেকে সেই বৃদ্ধই ভাগীরথীর কূলে মাতা মেরীর মূর্তি কুড়িয়ে পেয়ে নিয়ে এসেছে। এ যেন ধার্মিক দাক্রুজের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা। ভারতবর্ষ থেকে পর্তুগীজ জাতি লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু ধার্মিক দাক্রুজ আজও সকলের হৃদয়ে ফুল হয়ে ফুটে রয়েছে।

হুসেন শাহের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বাঙলা মুঘল সম্রাটদের করায়ত্ত হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে বাঙলা কিছুকাল সূর ও কররানী বংশীয় আফগান নৃপতিদের অধীন ছিল। সুলেমান কররানীর (১৫৬৫-১৫৭২) সেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দুদের দেবমন্দির ও দেবমূর্তি সমূহ ধ্বংসের জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।[১১] ইতিহাস কালাপাহাড়ের ধ্বংসোন্মাদ মূর্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেও 'একটি স্বপ্নের আহ্বান' শীর্ষক রচনায় ধর্মের অর্ন্তগত মানবতার এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। হুগলি জেলার ভুরসুট গ্রামের ব্রাহ্মণকুমার রাজীবলোচন রায় মায়ের উপর অভিমানে ছোটবেলায় পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন ভীমা দেবীর মন্দিরে। ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেন মা' এর ব্যাকুল আহ্বান তাঁকেই খুঁজে ফিরছে। সেই ডাক সেদিন তুচ্ছ করতে পারেননি, রাজু নামের ছেলেটি ফিরে গিয়েছিলেন মা'য়ের কাছে। কিন্তু সেই রাজুই একদিন নবাব দুহিতার প্রেমে মুসলমান হয়ে যান। আর সুলেমান কররানির সেনাপতি ব্রাহ্মণ রাজীবলোচন পরিণত হন কালাপাহাড়ে। সেই থেকেই ধ্বংসোন্মাদ কালাপাহাড় মন্দির ও মন্দিরের বিগ্রহ চূর্ণ করার নেশায় মেতে ওঠেন। একদিন সেই উদ্দেশ্যেই দেবী বর্গভীমার মন্দিরে এসে স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দেবী মূর্তির দিকে। দেবীর উগ্র দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই কোন এক দিব্য অনুভূতি লাভ করেন কালাপাহাড়, ঘুম নেমে আসে চোখের পাতায়। সেদিনও ঘুমের মধ্যে শুনতে পান ছোটবেলার সেই আহ্বান - 'রাজু ফিরে আয়'! ঘুম ভেঙে দেবী মূর্তির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হন সুলেমান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড়। প্রবল আক্রোশে দেবী বিগ্রহ ধ্বংস করতে এসে ফিরে যেতে বাধ্য হন, বর্তমানের তমলুকে দেবী বর্গভীমার মন্দিরটি যেন কালাপাহাড়ের মধ্যে দৃপ্ত বলের বিপরীতে মাতৃকার বাৎসল্য মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ইতিহাস কিন্তু কালাপাহাড়ের অর্ন্তনিহিত মানবমূর্তিটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় না, সে পরিচয় দেয়

কিংবদন্তী।

রাজা প্রতাপাদিত্য নির্মিত দুর্গটি মুঘল সেনানায়ক অপূর্ব সাহস ও কৌশলের বলে দখল করলে প্রতাপাদিত্য মুঘলের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। স্থির হয় মুঘল সেনাপতি গিয়াস খান নিজে তাঁকে ইসলাম খানের কাছে নিয়ে যাবেন এবং যতদিন ইসলাম খান কোন আদেশ না দেন, ততদিন পর্যন্ত মুঘল বাহিনী কাগরঘাঁটায় এবং উদয়াদিত্য রাজধানী ধুমঘাটে থাকবেন। ইসলাম খান প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে তাঁর রাজ্য দখল করেন। প্রবাদ রয়েছে, প্রতাপাদিত্যকে ঢাকায় একটি লোহার খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয়েছিল এবং পরে বন্দী অবস্থায় দিল্লী পাঠানো হয়, কিন্তু পথেই বারাণসীতে তাঁর মৃত্যু হয়।[১২] 'শরৎখানারদহ' গল্পে ইতিহাসের এই কাহিনিকে পরিবর্তিত রূপ দেওয়া হয়েছে। সংকল্পের পুরুষ প্রতাপাদিত্য তাঁর সংকল্পের সিদ্ধির জন্য পিতৃব্য বসন্ত রায় এর মুণ্ডচ্ছেদ করেন, আবার কখনো বা কল্পতরু হয়ে সোনা, রূপা, বস্ত্র ও ভূমির সঙ্গে নিজের স্ত্রীকেও দান করে দেন অক্লেশে। রানি শরৎকুমারী স্বামীর বিচিত্র ও ভয়ংকর কার্যাবলী লক্ষ্য করে নীরবে চোখের জল ফেলেন। ইতিহাসের কোন পাতাতেই এই চোখের জলের কাহিনি লেখা হয়নি। এমনকি মোগল সৈন্যের হাতে লাঞ্ছিত হবার চেয়ে আত্মমর্যাদা রক্ষা করার জন্য সখী পরিবৃত হয়ে শরৎকুমারী জলে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন যে কাহিনি সম্পূর্ণভাবে ইতিহাসে অবহেলিত। মোগল সুবেদার ইসলাম খাঁ এর সেনাপতি এনায়েৎ খাঁ' এর আক্রমণে প্রতাপাদিত্যের নৌবহর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলে রানি শরৎকুমারী প্রতাপাদিত্যকে উদ্বুদ্ধ করেন শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করতে। কিন্তু প্রতাপাদিত্য সেদিন তাঁর প্রতাপ বিসর্জন দিয়ে মোগল সেনাপতির কাছে আত্মসমর্পণ করেন। রানি শরৎকুমারী অপমানের আঘাত সহ্য করতে না পেরে কামারখালির খালে আত্মত্যাগ করেন। দেশ ও জাতির গৌরব রক্ষা করতে নারীর এ আত্মবিসর্জন যুগে যুগে সত্য। রাজস্থানের ইতিহাসে পদ্মিনীর জহরব্রতে আগুন জ্বালিয়ে আত্মত্যাগও বিদ্রোহী নারীর পরিচয় দেয়।

'পতিঘাতিনী সতী' বিষ্ণুপুর গড়ভবনের রাজা রঘুনাথ সিংহ এবং তাঁর স্ত্রী রানি চন্দ্রপ্রভার কাহিনি। যুদ্ধে যাবার সময় রাজা রঘুনাথ (১৬১৬-১৬৫৬)[১৩] তাঁর স্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যুদ্ধজয়ী স্বামীর কাছ থেকে কি উপহার পেলে রানি সুখী হবেন? প্রেমময়ী নারী চন্দ্রপ্রভা স্বামীর ভালোবাসা সহ ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রে পুণ্যতোয়া গঙ্গার জল প্রার্থনা করেন। কিন্তু দেখা যায় রাজা ফিরে আসেন রূপসী নর্তকী লালবাঈকে বিবাহ করে। শুধু তাই নয় তুর্কিনী লালবাঈ এর নির্দেশে ধর্মান্তরিত হবেন রঘুনাথ সিংহ, এ খবর নিজ কানে শুনেছেন রাণি চন্দ্রপ্রভা। কিন্তু স্বামীকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় জেনে বিষ্ণুপুরের সম্মান বাঁচাতে শান্ত সংযত নির্দেশ দান করেন চন্দ্র প্রভা। তাঁরই নির্দেশ মত লালবাঈকে হত্যা করে নতুন সরোবরের জলে নিক্ষেপ করে মন্ত্রী ও তার সহচরেরা। রাজা রঘুনাথকেও হত্যা করে মন্ত্রীর সহচরেরা। মন্ত্রী স্বয়ং রাজার সৎকারের আয়োজন করলে সকলেই চিতার সামনে এসে দুঃখ প্রকাশ করে কিন্তু এ ঘটনায় কারোও অনুশোচনা

হয় না। সকলেরই বিশ্বাস রঘুনাথকে হত্যা করে বিষ্ণুপুরের সম্মানই রক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে রানি চন্দ্রপ্রভা স্বামীর চিতায় সহমরণে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। রাজ্যের মান রক্ষা করতে, স্বামীঘাতিনী হয়েছেন যে নারী তিনিই আবার সকলকে চমকে দিয়ে চিতামঞ্চে স্বামীর শয্যার পাশে শয্যা গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরের যে আলোকটুকু বাঁচাতে একদিন ভয়ংকর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন রানি চন্দ্রপ্রভার সেই আরতির দীপ যেন আজও বহন করে চলেছে বিষ্ণুপুরের মন্দির। নিন্দা ও শ্রদ্ধা মিলে মিশে রানি চন্দ্রপ্রভা ঐ অঞ্চলের লোকের স্মৃতিতে জেগে রয়েছেন।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন ১৬০৫ খ্রীঃ। এই সময় শের আফগান ইস্তলজু নামক একজন তুর্কী জায়গীরদার বর্ধমানে বাস করতেন। তাঁর পত্নী অসামান্য রূপবতী ছিলেন। কথিত আছে জাহাঙ্গীর তাঁকে বিবাহের পূর্বেই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সম্ভবত এই নারীরত্ন হস্তগত করার জন্যই মানসিংহকে সরিয়ে জাহাঙ্গীর তাঁর বিশ্বস্ত ধাত্রী পুত্র কুৎবুদ্দীন খান কোকাকে বাংলাদেশের সুবাদার নিযুক্ত করলেন। কুৎবুদ্দীন খান বর্ধমানে শের আফগানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে বচসা ও বিবাদ হয় এবং উভয়েই নিহত হন। শের আফগানের পত্নী আগ্রায় মুঘল হারেমে কয়েকবছর অবস্থান করার পর জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং পরে নূরজাহান নামে তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হন।[১৪] নূরজাহান হিসেবে তাঁর এতটাই প্রতিপত্তি ছিল যে মুদ্রার একপিঠে যখন সেলিমের ছবি ছাপা হয়, মুদ্রার অপর পিঠে নূরজাহান তাঁর নিজের ছবি ছাপানোর কথাও ঘোষণা করেছিলেন। ইতিহাস নূরজাহানের খ্যাতির কথা মনে রাখলেও মনে রাখেনা জায়গীরদার পত্নী মেহেরউন্নিসার কথা। 'মেহের হামারা' গল্পে ইতিহাসের বড় সময় থেকে ছোটসময়কে বের করে এনে দেখানো হয়েছে। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নির্দেশে তাঁর অনুচর শের আফগানকে হত্যা করে সুন্দরী মেহের উন্নিসাকে নিয়ে আসেন বর্ধমান থেকে আগ্রায়। নিহত শের আফগানের পত্নী মেহেরউন্নিসা প্রথমে নূরমহল, তারপর নূরজাহানে পরিণত হলেন। জাহাঙ্গীরের প্রণয়ভাগিনী হয়ে মোগল বৈভবের সম্রাজ্ঞী হয়ে উঠলেন নূরজাহান। লিখিত ইতিহাস কোনো উত্তর দিতে পারে না, বর্ধমান থেকে চলে যাবার সময় মেহের উন্নিসার চোখে জল দেখা গিয়েছিল কিনা? কিংবদন্তী কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরকে ক্ষমা করেনা। বিচারকের মত রায় দান করে কিংবদন্তী। শের আফগানকে হত্যা করে জাহাঙ্গীরের প্রেম-প্রণয়ের ভয়ংকর পদ্ধতিকে কোনো গৌরব দান করে না। বর্ধমানের বুকে আফগানের সমাধি আজও আছে, কিন্তু বর্ধমানের কিংবদন্তী আগ্রার বাদশাহীর প্রেমকে অবজ্ঞা করে। বৃদ্ধ কৃষকেরা অবশ্য বলে, আজও গভীর রাত্রিতে ওড়নায় জড়ানো এক সুন্দরীর মূর্তি শের আফগানের কবরের কাছে এসে দাঁড়ায়। কিংবদন্তী বলে মেহেরউন্নিসাই আসেন। তাঁর অশ্রুমাখা গোলাপের পাঁপড়ি ছড়িয়ে দিয়ে যান কবরের ওপর।

ভারতবর্ষ যেমন নানা ঐতিহ্যের দেশ, তেমনি এই ভারতবর্ষেই যুগ যুগ ধরে নানা

কুসংস্কারের শিকড় চেতনার গভীরতর স্তরে পৌঁছে গেছে। বহু মনীষীরা তাঁদের শিক্ষিত রুচির দ্বারা সেসব সংস্কারকে পরিমার্জিত করার চেষ্টা করেছেন। কখনও তাঁরা এসেছেন সমাজ সংস্কারক রূপে, কখনো বা শুধুই গ্রন্থের পাতায় কলমের আঁচড়ে বিদ্ধ করেছেন ঐসমস্ত সংস্কারের মূলে। 'কিংবদন্তীর দেশে' গ্রন্থে সুবোধ ঘোষ 'গণেশজননীর আবির্ভাব' এবং 'লীলা ও চারণক' রচনায় একদিকে গঙ্গাজলে সন্তান বিসর্জন প্রথা অন্যদিকে সতীদাহ প্রথা দুটির বিরুদ্ধে প্রচলিত কাহিনিকে তুলে ধরেছেন।

চারশো বছরের পুরনো ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলেছেন 'গণেশজননীর আবির্ভাব' রচনায়। চাকদহের ধানের ক্ষেতে প্রাচীন খাতের চিহ্ন থেকে অতীতের একটি কাহিনি জীবন্ত রূপ পায়। রাজা প্রদ্যুম্ন রায় এর শাসনকালে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল, সেটি হল গঙ্গাগর্ভে সন্তান বিসর্জন। এই প্রথার নির্মম পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' গ্রন্থের 'দেবতার গ্রাস' শীর্ষক রচনায়। গঙ্গাসাগরে তীর্থস্নানের উদ্দেশ্যে মোক্ষদা শরণ নিয়েছিল মৈত্র মহাশয়ের। মোক্ষদা পুত্র রাখাল মায়ের কাছে বায়না ধরলে কুপিতা মায়ের উচ্চারিত বাণী - "চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।"[১৫] - একসময় সত্য হয়। রাখালকে সঙ্গে নিয়েই মোক্ষদা যাত্রা করে। কিন্তু পথে অসময়ে তুফান গর্জে উঠলে নৌকাসহ ডুবতে বসে মাঝিরা। সংস্কারের বশীভূত মাঝি মোক্ষদার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করে - "এই সে রমনী/দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে/চুরি করে নিয়ে যায়।"[১৬] - সত্য ভঙ্গ হলে নৌকা সকল যাত্রী সহ ডুবে যাবে এই আশঙ্কায় মোক্ষদার বুকের ধন রাখালকে কেড়ে নিয়ে মাঝি মাল্লারাই তাকে বিসর্জন দেয়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এইবার গঙ্গা বুঝি শান্ত হবে। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার মধ্য দিয়ে বার্তা পৌঁছে দেন তা হল দেবতার নাম করে কুসংস্কারান্ধ সমাজই এইসব প্রথার প্রবর্তন করছে। একইভাবে সুবোধ ঘোষের রচনায় গঙ্গার ভক্ত প্রদ্যুম্ন রায়ের নির্দেশে রাজ্যে প্রচারিত হয় গঙ্গামাহাত্ম্য, এরই ফলে নিঃসন্তানা নারী সন্তান লাভের আশায় মানত করে - "সন্তান দাও মাতা গঙ্গা, প্রথম সন্তান তোমাকেই উপহার দেব।"(৪০৭ পৃ.) রাজ্যের মঙ্গল কামনা করে পুরোহিত উচ্চঃস্বরে মন্ত্র পাঠ করে, নারীও তার কোল থেকে স্নেহসুপ্ত শিশুকে ছিন্ন করে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করে। কিন্তু এই প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে একদিন প্রদ্যুম্ন রায়ের ভাই জয়কৃষ্ণ তার শিশুসন্তানকে বিসর্জন না দিয়ে সন্তানের কল্যাণে দরিদ্রকে বস্ত্র দান করে। প্রদ্যুম্ন রায়ের-রাজোচিত সম্মান ক্ষুন্ন হয়, একই সঙ্গে আশঙ্কা প্রবল হয়, এই শিশুটিই প্রদ্যুম্নের পুত্রের ভাবীশত্রু। তার আশঙ্কা যাতে সত্য না হয় একারণে পুরোহিতকে ডেকে স্মরণ করিয়ে দেয় জয়কৃষ্ণের পুত্রের ছয়মাস পূর্ণ হলে তাকে গঙ্গায় বিসর্জন দেবার মানত করেছিল ইন্দুমতী। রাজ্যজুড়ে সকলের কঠিন বিশ্বাসকে শান্ত করতে ইন্দুমতী তার কোলের সন্তানকে তরঙ্গের বুকে নিক্ষেপ করে। পরক্ষণেই উন্মাদিনীর মত চিৎকার করে ওঠে। গঙ্গার তরঙ্গও নারীর আর্ত চিৎকারে চূর্ণ হয়ে গেল। শিশুর দেহ তটভূমির উপরে এসে লুটিয়ে পড়ে। উন্মাদিনী মাতা তার সন্তানকে নিবিড় আগ্রহে বুকের কাছে চেপে ধরলে পুরোহিতের কঠোর স্বরে আপত্তি - "ধর্মভ্রষ্ট হয়ো না নারী, ও সন্তান তোমার সন্তান নয়।" -

দেবীকে উৎসর্গ করা সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে ইন্দুমতী রাজ্যচ্যুত হয়। কোথায় কোন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় ইন্দুমতী তা কেউ জানে না। রাজা প্রদ্যুম্নও তার সন্তানের শত্রুকে খুঁজে বের করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত এক কাহিনি শুনতে পায় প্রদ্যুম্ন, গণেশজননী তাঁর শিশু সন্তানকে বক্ষে ধারণ করে দেখা দেন দীর্ঘিকার কিনারায়। সকলের বিশ্বাস গভীর রাতে গণেশজননী স্বয়ং আসেন। রাজা প্রদ্যুম্ন রায় কল্পনায় দেখতে পায় ঐ নারীর কোলেই বড় হয়ে উঠছে তার পুত্রের ভবিষ্যৎ রাজগৌরবের শত্রু। রাজার নির্দেশ সত্ত্বেও প্রজা সাধারণ তাদের বিশ্বাসের দ্বারা গড়ে তোলে একটি মন্দির, যেখানে গণেশজননীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সন্তান কোলে নারীর যে মূর্তি তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে সে মূর্তি দেবী গঙ্গার শত্রু, কারণ "বাৎসল্য বিধূর ঐ মূর্তি যে সন্তানকে কোলে ধ'রে রাখার ধর্ম শিক্ষা দেয়।" (৪১১পৃ.) একদিকে নারীর সন্তান বিসর্জন অন্যদিকে সন্তানকে বক্ষে ধারণ করে নারীর বাৎসল্য এই দুই মূর্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি। ভৌগোলিক কোনো কারণেই হয়ত একদিন সরে গিয়েছে গঙ্গার জল, বন্ধও হয়েছে সামাজিক কুপ্রথা-সন্তান বিসর্জন। তবুও পালপাড়ার মন্দিরের কাছে প্রদ্যুম্ন সরোবরটি স্মরণ করিয়ে দেয় প্রদ্যুম্ন রায়ের রাজত্বে ঘটে যাওয়া একটি অপকীর্তিকে। কালের গতিতে সে প্রথা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু মানুষের বিশ্বাস গণেশজননীর আবির্ভাবই এই প্রথা বন্ধের মূল কারণ। তাই চারশো বছর পরও চাকদহের আনন্দগঞ্জ বাজারে গণেশজননীর পূজা হয়, সেই উপলক্ষে মেলাও বসে। সমস্ত হৈ হুল্লোড়ের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয় এক সত্য, অন্ধ সংস্কারের পাথর ফাটিয়ে বাৎসল্য তথা মানবতার জয়।

কলকাতা শহরের সেন্ট জন গির্জার প্রাঙ্গনে পাশাপাশি জোব চারণক ও লীলা চারণকের সমাধি নর-নারীর বিচিত্র অনুরাগের স্মৃতিকে চিরন্তন করে। এই স্মৃতিতেই জনশ্রুতি প্রচলিত হয়। ইতিহাসে মহানগরী কলকাতার পত্তনকারী জোব চারণকের কথা লিখিত রয়েছে। জোব চারণক যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন তখন কলকাতার জমিদার মজুমদারদের পর্তুগীজ বরকন্দাজ ছিল। ১৬৩২ খ্রীঃ হুগলী থেকে পর্তুগীজরা বিতাড়িত হবার পরই তাদের শূন্যস্থান দখল করে ইংরাজরা। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় ইংরেজরা এদেশে এসেছে। হুগলীতে থাকাকালীন নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ বাধে। ১৬৮৬ খ্রীঃ চার্ণক সুতানটি গ্রামে এসে উপস্থিত হন। এরপর মুঘলদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই হয়। চার্ণক সেখানে যান। লড়াই এর শেষে চার্ণক আবার সুতানটিতে ফিরে আসেন। তারপর মাদ্রাজ যান। কিন্তু ১৬৯০ খ্রীঃ আবার সুতানটিতে ফিরে আসেন এবং ইংরেজদের শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৬৯৮ খ্রীঃ জুলাই মাসে ইংরেজরা মাত্র ষোল হাজার টাকায় কলিকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনে নেয়। প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা শহর।[১৭] কিংবদন্তী কিন্তু ইতিহাস প্রসিদ্ধ চারণকের জীবনের অন্য এক গল্প বলে। কিংবদন্তী পরিচয় দেয় কুঠিয়াল চারণকের ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-অপ্রেমের। কলকাতা মহানগরীর পত্তন হয়েছিল যার হাতে এবং যে কারণে ইতিহাসে তিনি খ্যাত সেই জোব চারণকের জীবনের অকথিত এক প্রেমের,

একনিষ্ঠতার কাহিনি রয়েছে 'লীলা ও চারণক' কিংবদন্তীতে। গঙ্গার কিনারে এক মেলায় চারণকের সঙ্গে দেখা হয় লীলার। ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর কন্যা লীলার সীমন্তে সিঁদুরের রেখা দেখতে পেয়েও নারীর কালো চোখ তাঁকে মুগ্ধ করে। লীলাও পরপুরুষ চারণকের প্রতি আসক্ত। এমনকি তিন বছর বয়সে যে ব্রাহ্মণ তার সীমন্তে সিঁদুর দান করে চলে গেছেন বারাণসী ধামে সেই স্বামীর মূর্তি মনেও আনতে পারেনা লীলা। প্রতিদিন পালকিতে করে স্নানঘাটে উপস্থিত হয় লীলা, পালকির অন্তরালবর্তিনী নারীর মুখ দেখতে পান চারণক। প্রভাতের সূর্যোদয় দেখার মতই লীলার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন চারণক। কিন্তু একদিন পালকিতে লীলা আসে না, নদীতীরে দেখা যায় সহমরণের ব্যবস্থা হয়েছে লীলার। বারাণসীতে তার স্বামীর দেহান্ত হয়েছে তাই তাঁর পাদুকার সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে লীলাকে। লীলা দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পায় চারণককে, তাঁর প্রণয়দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে লীলা অস্বীকার করে সহমরণে যেতে। পুরোহিতের প্রশ্নে লীলার জবাব - "মনের মধ্যে মিথ্যা রেখে মৃত্যু বরণ করতে চাই না।"(৫৫১ পৃ.) যে স্বামীকে তার মনেও পড়ে না সেই স্বামীর অনুরাগিনী যে হতে পারেনি, তাঁর মৃত্যুতে সহমরণে যাওয়া সম্ভব নয় লীলার। সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে কঠিন পরিহাস করতেই যেন এ কাহিনির উদ্ভাবন। কাহিনির পরিণতিতে এসে অমানবিক পৈশাচিক এই কার্যের বিপরীতে সুবোধ ঘোষ মানবিক সম্পর্কের সবচেয়ে নির্মল দিকটির প্রকাশ করেন। চিতাকে অস্বীকার করায় জনগণের ভিড় লীলাকে অসতী আখ্যা দিলে চারণক তাঁর জীবনের প্রথম অনুরাগের নারীকে আশ্রয় দেন। কিন্তু তাঁদের এই মিলন স্থায়ী হয়নি। কয়েকটি সন্ধ্যার পর লীলার মনে সন্দেহ দেখা দেয়। চারণক তাকে হাত ধরে কুঠিতে আশ্রয় দিলেও তাঁর জীবনসঙ্গিনী রূপে লীলাকে গ্রহণ করতে পারবেন কী? এই হৃদয়দহন ও সংশয়ের জ্বালা সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। লীলা তাই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু চারণক এসে এবার তাকে গ্রহণ করেন ধর্মপত্নীরূপে। জীবনে তাদের অনুরাগে ছেদ পড়েনি, এমনকি মৃত্যুতেও নয়। ভারতীয় নারীর প্রতি ইংরেজ জাতির এই বিধর্মীয় প্রেমের নিদর্শন কিন্তু ঐ সমাধি সৌধ। সহমরণ প্রথায় নারীকে যেভাবে সতী আখ্যা দেওয়া হত সেখানেও হৃদয়গত ফাঁক থেকে যেত অনেক, চারণকের প্রতি প্রণয়াসক্তিতেই লীলা আঘাত হানে সামাজিক সংস্কারের একেবারে মূলে।

'একটি বুলবুলের শিস' গল্পে নর-নারীর প্রণয় সম্পর্কের আরো একটি দিক উঠে আসে। দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের কন্যা আমিনার পাণিপ্রার্থী হুসেন খাঁ জানতে পারেন তাঁর প্রণয়িনী আমিনা মনসবদার ওসমানের পালিত বুলবুলের শিসে মুগ্ধ হন। সামান্য বৃত্তির মনসবদারের এই ঔদ্ধত্য মেনে নিতে পারেন না হুসেন খাঁ। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে তাঁর হৃদয়ে। হিংস্র আঘাতে স্তব্ধ করে দিলেন বুলবুলের শিস। তবুও বাধা মানে না ওসমান ও আমিনার প্রেম। সকল আক্রোশ থেকে সরিয়ে নিজেদের প্রেমের প্রতিষ্ঠা করেন। বীরভূমের হেতমপুরে হেতম খাঁর কাছে আশ্রয় লাভ করেন। কিন্তু ছদ্মবেশী হুসেন খাঁ তাঁর প্রণয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধানে ছুটে বেড়ান নদী, পাহাড়, বন জঙ্গলের নানা প্রান্তরে। ফকিরবেশী হুসেনের

সন্দিগ্ধ চোখ যথাযথই নির্ধারণ করে নেয় আমিনা ও ওসমানকে। বর্গী ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওসমান ওরফে হাফেজ খাঁর গড় চূর্ণ করেন হুসেন খাঁ। নিহত হন হাফেজ খাঁ ওরফে ওসমান। অথচ তাঁরই বহুকাঙ্ক্ষিতা নারী-আমিনার সন্ধান পান না হুসেন খাঁ। ভবনের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে বহু সন্ধানের পর দেখতে পান শাহজাদী আমিনা মুগ্ধ হয়ে শুনছেন তাঁর প্রেমিকের বুলবুলের শিস। এই একটি শিসই ওসমান আমিনার মিলন ঘটিয়েছে আবার বুলবুলের শিসই হুসেন খাঁর কাছে তাঁদের ধরিয়ে দিয়েছে।

নারায়ণগড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গর্দ্ধবপাল তাঁর রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রহ্মাণী দেবীর মন্দির।[১৮] 'মধুমঞ্জরীর চোখের জল' গল্পে দেবী ব্রহ্মাণীর মহিমাগাথা কাহিনি রূপ পেয়েছে। রানি মধুমঞ্জরী একদিন স্বপ্নে জানতে পান দেবী তৃষ্ণার্ত হয়ে আছেন। মধুমঞ্জরীর অনুরোধে গর্দ্ধবপাল এক সরোবর খনন করান, স্বর্ণপাত্রে সেই স্বচ্ছজলেও দেবী তুষ্ট হন না, রানিকে আবারও স্বপ্নে দেখা দিয়ে দেবী জানালেন সুখী মধুমঞ্জরীর চোখের জলে তাঁর পিপাসা শান্ত হবে। নানা উপায় অনুসন্ধানের পর রানির জনৈকা দাসীর পরামর্শে মধুমঞ্জরী গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, গ্রামের পথে তিনি দেখলেন, ''জলশূন্য কূপ ও শুষ্ক তড়াগ, কতগুলি দাবদগ্ধ অতিকায় সরীসৃপের শূন্য বিবর। পিপাসাতুর গোবৎস মাতা গাভীর সজল চক্ষু লেহন করছে। ঘরে ঘরে মানুষের শিশু তৃষ্ণায় কাঁদছে। ভেজা মাটি মনে ক'রে এক টুকরো কালো মাটির উপর তৃষ্ণার্ত পাখির ঝাঁক এসে ঠোঁট ঘষছে। নরনারীর দল ছোট ছোট মৃৎপাত্র হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছে দূরান্তরের কোন্ এক জলাশয়ের দিকে, জল সংগ্রহের আশায়।''(৪০৯-৪১০পৃ. ৫ম) এখানেই তিনি জীবনের অন্য একটি দিক দেখলেন। এই করুণ দৃশ্যে মধুমঞ্জরীর চোখে জল এল। চাঁদের আলোকিত পিঠের বিপরীতে যেমন অন্ধকার রয়েছে তেমনি জীবনের সুখের বিপরীতে রয়েছে দুঃখ। জীবনের এই সত্যকে অনুভব করলেন মধুমঞ্জরী, তার চোখেও জল দেখা দিল। যে চোখের জলের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে রয়েছেন ব্রহ্মাণী দেবী। দুঃখে কাতরা রানির অনুরোধে ঐ গ্রামে একটি সরোবর স্থাপন করা হল। সেই সরোবরের জলে চোখ ধুয়ে মধুমঞ্জরী দেবী ব্রহ্মাণীর তৃষ্ণা মেটালেন। নারায়ণগড়ের মধুমঞ্জরীর চোখের জল শুধু 'রানীসাগরের' জলেই বহমান, ইতিহাস মনে রাখে না মধুমঞ্জরীকে। সুখিনী নারী দুঃখের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করে এই 'রানীসাগর' যার জলে একটি শালুক ফুটে থাকে।

ওসমান বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁর ইতিহাস থেকে জানা যায়, ওসমানের পিতা খাজা ঈশা উড়িষ্যার শেষ পাঠান রাজা কুৎলু খানের ভ্রাতা ও উজীর ছিলেন এবং মানসিংহের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। সন্ধির পূর্বেই কুৎলু খানের মৃত্যু হয়েছিল। খাজা ঈশার মৃত্যুর পর পাঠানেরা আবার বিদ্রোহী হয়, মানসিংহ তাদের পরাজিত করলেন। ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য তিনি উসমান ও অন্য কয়েকজন পাঠান নায়ককে উড়িষ্যা থেকে দূরে রাখবার জন্য পূর্ব বাংলায় জমিদারি দেন। পরে উড়িষ্যার এত কাছে তাদের রাখা নিরাপদ মনে না করে এই আদেশ নাকচ করেন। এতে বিদ্রোহী হয়ে তারা

সাতগাঁওয়ে লুঠপাট করতে আরম্ভ করল, সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে ভূষণা লুঠ করল এবং ঈশা খানের সঙ্গে যোগ দেয়। বোকাই নগরে ওসমান দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি আজীবন ঈশা খান ও মুসা খানের সহায়তায় মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।[১৯] 'রানি রায়বাঘিনী' রচনায় কিংবদন্তী আছে, ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজা রুদ্রনারায়ণের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে উড়িষ্যার পাঠান অধিপতি কতলু খাঁ। মোগল বিরোধী এই যুদ্ধে কতলু খাঁ এর সঙ্গে যোগ দিতে নারাজ রাজা রুদ্রনারায়ণ। কতলু খাঁর সেনাপতি ওসমান এই বার্তা নিয়ে এলে রানি ভবশংকরী সেই পত্র ছিন্ন করে তার জবাব দেন। এমনকি মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে রানি ভবশংকরী হাতে তুলে নেন তরবারি, রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর রাজ্য শাসনের ভার নিজের হাতে তুলে নেন। স্বামীর ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যে প্রতি অমাবস্যায় মনিনাথ মহাদেবের মন্দিরে রাজ্যের কল্যাণ প্রার্থনা করেন। এমনই এক অমাবস্যার রাত্রিতে গড়বসন্তপুরের গর্বকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে চতুর ব্যাধের মত সেনাপতি ওসমান আক্রমণ করে মনিনাথ মন্দির, যেখানে মুষ্টিমেয় সৈন্যরক্ষী সহ রানি ভবশংকরী এসেছেন। সেদিন কিন্তু ভবশংকরীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় রক্ষী-সৈন্যরা পরাজিত করে পাঠান সৈন্যদের। দামোদর পার হয়ে পরাভূত ওসমানের সৈন্য পলায়ন করে। রানির অপূর্ব রণকুশলতা ও সাহসিকতার কাহিনি শুনে বাদশাহ আকবর তাঁকে রায়বাঘিনী উপাধি দেন। ইতিহাসের পাতায় কতলু খাঁ, ওসমান এবং মোগলসৈন্যের অসামান্য যুদ্ধের ঘটনা বারংবার বর্ণিত হলেও উপেক্ষিত থেকে গেছে ভবশংকরীর মত নারীরা। যে রানি রাতের অন্ধকারে বৈধব্যের জ্বালা ভুলতে চোখের জল মোছেন সেই হাতেই সকালের আলোয় তরবারি ধারণ করেন। ইতিহাস কিন্তু রানি ভবশংকরীর চোখের জল বা বীরত্বের কোন খবরই রাখে না। রায়বাঘিনী নামের গৌরব টুকু বেঁচে আছে সাধারণের মুখে। নিদর্শন রূপে রয়েছে বসন্তপুরের মনিনাথ মন্দির এবং রায়বাঘিনীর সমাধি, যাকে ঘিরে কল্পনায় গড়ে উঠেছে নানা কাহিনি।

ইতিহাসের অপর এক নারী শিরোমণি আজও বেঁচে আছেন শুধুমাত্র জনশ্রুতিতে। 'রানি শিরোমণি' রচনায় সেই কিংবদন্তী গল্পের মোড়কে পরিবেশন করেছেন সুবোধ ঘোষ। ইংরেজের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন রাজ্যগ্রাসের জন্য বাহু বিস্তার করেছে নানা দিকে তখন তাদেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে সামন্তিক ভূস্বামী আর ভূস্বামীদের প্রজা। এই প্রজাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আক্রোশ নিয়ে জেগে ওঠে চুয়াড় এর দল, যে সব প্রজারা বিনা বাধায় জঙ্গল ভোগ করতে এবং বিনা করে ভূমি চাষ করতে অভ্যস্ত। বাঁকুড়া জেলার অর্ন্তগত রায়পুরের জমিদার দুর্জন সিংহ চুয়াড়দের সাহায্যে বহু পরগণা লুঠ করতে সক্ষম হয়েছিল। চুয়াড়দের বিদ্রোহের সময় ইংরাজ সরকার রানি শিরোমণিকে ওই বিদ্রোহের নেতা ভেবে ১৭৯৯ খ্রীঃ ৬ এপ্রিল তাঁকে তাঁর অমাত্যসহ বন্দী করে কলকাতায় নিয়ে আসে। কর্ণগড় ইংরেজ সৈন্যদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। মুক্ত হবার পর রানি শিরোমণি আর কর্ণগড়ে বাস করেন নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মেদিনীপুরের আবাসগড়ে বাস করে এই নির্ভীক রমণী ১৮১২ খ্রীঃ ১৭ সেপ্টেম্বর

মারা যান।[২০] কিংবদন্তীর পাঠক এই ইতিহাস থেকে খুঁজে পান কোন এক ব্যর্থ প্রেমের আক্রোশ। যে আক্রোশে চুয়াড় বিদ্রোহ তার শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। গ্রামের ছেলে জনার্দন গ্রামের মেয়ে শিরোমণির প্রতি আকৃষ্ট হলেও একদিন শিরোমণি কপালে সিঁদুর আর পায়ে আলতা পরে সত্যই রানি হয়ে চলে গেল গ্রাম ছেড়ে। জনার্দন মেনে নিতে পারে না শিরোমণির এই সৌভাগ্যের সিঁদুরকে। শিরোমণির সর্বনাশ কামনা করে এবং সেদিন থেকেই সন্ন্যাসী হয়ে যায় জনার্দন। ফিরে আসে শিরোমণির সর্বনাশের অস্ত্র হাতে নিয়ে। ইংরেজের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভ্রূকুটি যখন উগ্র হয়ে উঠেছে, ভূস্বামীর দল ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে। সেদিন বিশ্বাসভঙ্গের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বন্য বিদ্রোহীর দল হিংস্র হয়ে ওঠে। রানি শিরোমণি তাদের উৎসাহ দিয়ে ঘোষণা করে - ''জঙ্গল মহালের মাঠ ঘাট ক্ষেত আর নদীতীর থেকে কোম্পানির সৈনিককে দূর করার জন্য প্রস্তুত হও।''(৪১৪ পৃ.) - কর্ণেল ইলবার্ট জানতে পেরে যায় রানি শিরোমণি চুয়াড়দের ক্ষেপিয়ে তোলার মূলে রয়েছেন। শিরোমণিকে বন্দী করার পথ খুঁজতে ইংরেজের উৎকোচে চর লাগানো হয়। কর্ণগড়ের রানি শিরোমণিকে বন্দী অবস্থায় পেতে চায় সন্ন্যাসী জনার্দন। তাই কর্ণেল ইলবার্ট এর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। চর হয়ে প্রবেশ করে কর্ণগড়ে। বুঝতে পারেনা রানি শিরোমণি, মিথ্যে প্রেমের ভান করে রানিকে দুর্বল করে দিয়ে গুপ্ত পথ জেনে নেয় জনার্দন। সেই পথেই কোম্পানির দল আক্রমণ করে স্বাধীন কর্ণগড়। কিন্তু ইংরেজের হাতে বন্দিনী হবার পরই রানি শিরোমণি অদৃশ্য হয়ে যায়। চুয়াড়ের দল ইংরেজ সৈনিকের হাতে পরাস্ত হয়েও মাতৃহারা অসহায় বালকের মত খুঁজে ফেরে রানিমাতাকে। পদ্মকুড়ির পাপড়ি আঁকা চরণচিহ্ন রেখার দিকে তাকিয়ে সন্ধানী দৃষ্টি বুঝতে পারে কাঁসাই এর জলেই রানি শিরোমণি আত্মত্যাগ করে। কিন্তু অবুঝ বিশ্বাসী চুয়াড়ের দল বলে রাজরাজেশ্বরী মূর্তির মধ্যেই মিলিয়ে গেছে রানি শিরোমণি। রানি শিরোমণিকে না পেয়ে জনার্দনের হতাশার আগুন আরও হিংস্র হয়ে জ্বলে ওঠে। ইতিহাস কিন্তু চুয়াড়দের পরাজয় ও রানি শিরোমণির মেদিনীপুর আবাস গড়ে জীবন কাটানোর কথা জানায়। কিংবদন্তী খোঁজে ব্যর্থ প্রেমিকের ব্যর্থতার কাহিনিকে।

'সবিতার দাসী সাবিত্রী' নামক কাহিনিতে সাধারণ মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধায় দেবী রূপে পূজিতা হয় সাধারণ মানবী মূর্তি। সংসারে কন্যার অভাব অনুভব করে দস্যু পিতা স্নেহের ঘরের অভাব পূরণ করতে তীর্থযাত্রী দম্পতির কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় এক শিশুকন্যাকে। দস্যু পিতার কাছেই বড় হয়ে ওঠে সাবিত্রী, কিন্তু তার আরাধ্য দেবতা সবিতার দাসী হয়েই জীবন কাটাতে চায়। পুরুষের কাঙ্ক্ষিত লালসার ছোবল থেকে নিজেকে বাঁচাতে দৈবী খড়্গ লাভ করে। নবীন রাজার বিলাসময় ঐশ্বর্যের কাছেও নিজেকে সঁপে দিতে চায় না। সেকারণেই প্রেমিকের আবেদনেও সাড়া দিতে পারে না সাবিত্রী। বিবাহ লগ্ন উপস্থিতির মুহূর্তে দাসী- সাবিত্রী সবিতার কাছেই নিজেকে সঁপে দেয়। মানবিক প্রেমানুভূতির জগৎ থেকে ব্যপ্ত এক লোকের সন্ধানে বালুকা পুঞ্জের প্রান্তরে এসে দাঁড়ায়। ধরিত্রী দ্বিধা হয়ে যেভাবে সীতাদেবীকে স্থান

দিয়েছিলেন, সেভাবেই বালুকাপুঞ্জ তার আপন হৃদয়ে ঠাঁই দেয় সাবিত্রীকে। প্রেমিক রাজা দৌড়ে এসে সাবিত্রীকে বাধা দিতে গেলে সাবিত্রীর কেশগুচ্ছই অবশিষ্ট থাকে। সেই কেশগুচ্ছ এবং দৈবী খড়্গকেই সুরক্ষিত করে মন্দিরে স্থাপন করা হয়। মানবী হয়েও সবিতার দাসী সাবিত্রী মানুষের শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে দেবী হয়ে গিয়েছে।

নারীর ভিন্ন মানসিকতার সঙ্গে সাধারণের বিশ্বাস জড়িয়ে গড়ে উঠে দেবী মূর্তি। 'ডুমনীতলার মা' এমনই এক কাহিনিকে বহন করে। নারীর ভিন্ন রূপের মধ্যে মাতৃরূপ আবহমান কালের সত্য এক মূর্তি। মুর্শিদাবাদের ন'পুকুরের ইতিহাস বলে, অপূর্ব রূপবতী কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে ভূস্বামী যুবক তাকে বিবাহ করে। অগ্নি সাক্ষীর এই বিবাহে সন্তুষ্ট হয়ে নববধূর হৃদয়ে জেগে ওঠে মাতৃত্বের বাসনা। স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরভিটার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পরে। নৌকার মাঝি মাল্লারা ঘোর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। নৌকায় খাদ্যসামগ্রী থাকলেও রন্ধনের ইন্ধন নেই। নববধূ কিন্তু সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে কাঁচা বাঁশের হালকা চটার স্তূপ গড়ে তোলে। তার কটি বস্ত্রের আড়ালে লুকিয়ে রাখা অস্ত্র এবং এ ধরণের কাজে দক্ষতায় ভূস্বামী যুবকের মনে সন্দেহ জাগে। বংশ গৌরবে গর্বিত ভূস্বামী যুবক স্ত্রীর জাতের পরিচয় জানতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সন্দেহ হয় নারী নিশ্চয়ই ডোমের মেয়ে। তাই ষড়যন্ত্র করে তাকে নদীর ঘাটে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। নববধূর সন্তান কোলে নেবার আশাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ভূস্বামী যুবক নারীকে যে অসম্মান করেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই যেন নারী কঠিন পাথরে পরিণত হয়েছে। সেই রাত্রেই এক ডোমের কন্যা স্বপ্ন দেখে, বনের ধারে শিলাময়ী দেবীর পূজার ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। বংশ গৌরবের সকল ঘৃণার বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদ আজও শিলীভূত হয়ে রয়েছে এই মূর্তিতে। মাতৃত্বের বাসনা নিয়ে নারীর এই অসম্মান হলেও কঠিন পাথরের মূর্তির কাছে সহজ সরল বিশ্বাস নিয়ে আসে ডোমপাড়ার মৃতবৎসা জননী, নিঃসন্তানা নারী। সকলের বিশ্বাস ডুমনীতলার শিলাময়ী মা সকলকেই আশ্বাস দিচ্ছেন। গ্রাম্য নারীর বিশ্বাসে সাধারণ নারী দৈবী মহিমা লাভ করেছে।

বহুভোগ্যা নারীর জীবনেও প্রেম আসে, আর তারই মূল্য দিতে প্রস্তুত যে কোন উপায়ে। 'পুন্ড্রবর্ধনের নর্তকী', 'সনকা ও মেনকা' কাহিনি দুটি নারীর সেই রূপকে মূল্য দেয়। কাশ্মীররাজ জয়াপীরের কবল থেকে পুন্ড্রবর্ধনকে রক্ষা করে নর্তকী কমলা। 'পুন্ড্রবর্ধনের নর্তকী' কাহিনি ইতিহাসে অবহেলিত সেই নারীর পরিচয় দেয়। ছদ্মবেশী জয়াপীড়কে চিনতে পেরেছে কমলা। জয়াপীড়কে ভালোবাসে কমলা। কিন্তু জয়াপীড়ের হাতে পুন্ড্রবর্ধনের গৌরব নষ্ট হতে দিতে পারে না পুন্ড্রবর্ধনের নর্তকী। একদিকে প্রণয়ীর প্রাণ, অন্যদিকে পুন্ড্রবর্ধনের স্বাধীনতা দুই-ই রক্ষার উপায় সন্ধান করে কমলা। পুন্ড্রবর্ধনের রাজা ঘোষণা করেছেন, "যে সাহসিক পুরুষ ঐ সিংহকে হত্যা করতে পারবে, তারই হাতে তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা কল্যাণদেবীর পাণি সমর্পণ করবেন।" (৯৭পৃ.) নর্তকী কমলা উপায়ান্তর না পেয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নেয়, সিংহ হত্যার দায়িত্ব

নিতে হবে জয়াপীড়কেই এবং তারই পরামর্শমত সিংহ হত্যার পর রাজার ঘোষণানুযায়ী রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহোৎসব সংঘটিত হয়। নর্তকী কমলার এই রহস্য সেদিন বুঝতে পারেনি জয়াপীড়। সে সন্দেহ করে সিংহ হত্যায় জয়াপীড়ের উপস্থিতির চিহ্ন দেখে রাজশত্রুকে ধরা অনেক বেশী সহজ হবে হয়ত। এমনকি রাজানুচরদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে যে মুহূর্তে কমলার ভবন ত্যাগ করে, সে মুহূর্তেও নর্তকীর চোখের জল আর মুখের হাসিকে অবিশ্বাস করে জয়াপীড়। পুন্ড্রবর্ধনের রাজপ্রাসাদের উদ্যানে যেদিন আলোর রোশনাই দেখা দেয়, রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হয় পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী। সেদিন কিন্তু নর্তকী কমলার স্বরূপ বা প্রকৃতি স্পষ্ট হয় তার কাছে। নর্তকী হলেও পুন্ড্রবর্ধনের কমলা প্রণয়ীর ভালোবাসাকে তুচ্ছ করে রাজ্যের গৌরব রক্ষা করে যে দৃষ্টান্ত রেখেছে তার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করে জয়াপীড়। সেই ভুল ভেঙ্গে যেতেই কমলার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে জয়াপীড়। রাজ্যের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধাকেই সম্মান করে জয়াপীড় গ্রহণ করে কমলাকে। সুন্দরেশ্বর দেবতাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের মিলন সংঘটিত হয়।

নর্তকীর প্রেমের শুচিতা প্রমাণিত হয় 'সনকা ও মেনকা' রচনায়। রাজকুমার পুন্যরত্ন তাঁর মিথ্যা প্রণয়ে ভুলিয়ে রাখেন নর্তকী সনকাকে, অন্যদিকে নর্তকী মেনকাও বিশ্বাস করে পুন্যরত্নের মহিষী হয়ে রাজঅন্তপুরে দাঁড়াবার যোগ্যতা বা সৌভাগ্য একমাত্র তারই। রাজকুমার পুন্যরত্ন দুজন রূপময়ী নাগিনীর কাছেই মিথ্যে আকাঙ্ক্ষার কথা শোনান। নানা কপটতার পরও যখন পুন্যরত্নের প্রেমের লোভে দুই নারী কামার্ত হয়ে উঠেছে সেদিন পুন্যরত্ন নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন। ভালোবাসার আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে দুই নারীকেই পরীক্ষা দিতে হয়। যার হাতের পুষ্পমাল্য বেশী সুন্দর হবে তাকেই বরণ করবেন পুন্যরত্ন। নির্দিষ্ট লগ্নে পুন্য প্রভাতে পুষ্পমাল্য হাতে দুই নারী রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে গিয়েই দেখতে পায় - "প্রসন্ন প্রভাতের স্নিগ্ধতাকে আরও স্নিগ্ধ করে দিয়ে পথ হেঁটে চলেছেন এক সৌম্য মূর্তি জ্ঞানী, সঙ্গে কতিপয় শ্রমণ।" (৫০৯ পৃ.) - সোমপুর মহাবিহারের মহাস্থবির রত্নাকর শান্তিকে দেখে দুই রাজনর্তকীর হৃদয়ের উদ্‌ভ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা স্তব্ধ হয়ে যায়। পুন্যরত্নের জন্য আনা পুষ্পমাল্য পথের ধূলির ওপর ফেলে দিয়ে চোখের জলে তাদের হৃদয়ের কালিমা ঘুচিয়ে নেয়। জীবনের অন্ধতা ঘুচে যায় তাদের। পথের দু'ধারে পড়ে রইল কামনাময় জীবনের দুটি পুষ্পমাল্য। অন্যদিকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী নারীকে চরম অপমানের উদ্দেশ্যে বাতায়নে দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত পুন্যরত্ন নেমে আসেন পথে। সংঘারামে পৌঁছে দেখতে পেলেন, "স্তূপ পাদমূলে প্রদীপের আলোকে দাঁড়িয়ে ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করছে দুই ভিক্ষুণী। হ্যাঁ, সনকা ও মেনকাই বটে।"(৫১০ পৃ.) - এই দৃশ্যে তাঁর প্রেমের অহংকার চূর্ণ হয়ে যায়। মাথা উঁচু করে ঐ দুই নারীর সম্মুখে দাঁড়াবার সাহস হারিয়ে ফেলেন পুন্যরত্ন। ফিরে আসেন রাজপ্রাসাদের দিকে। প্রচলিত আছে যে নিজের মনের অহংকারের ভার হয়ত সেদিন সহ্য করতে পারেননি পুন্যরত্ন। কিন্তু রাজনর্তকী সনকা ও মেনকার ভিক্ষুণীতে পরিণত হয়ে এক পরিবর্তনকেই সূচিত করে। রাজকুমার পুন্যরত্নের প্রেমের লোভে অন্ধ হয়েছিল

সনকা ও মেনকা, কিন্তু রত্নাকর শান্তির দর্শনে তাদের হৃদয় শুচি শুদ্ধ হয়ে যায় যে রূপ পুন্যরত্নের হৃদয়েও কামনার অধিক এক শুদ্ধ শুচিতাকে জাগিয়ে তোলে।

অর্থলোলুপ এক শ্রেণীর মানুষ সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ ভোগ করতে পারে না যথাযথভাবে। মৃত্যুর সময়ও তারা ঐ অতৃপ্তি নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। সংস্কার বলে তাদের প্রেতাত্মা ঐ সম্পত্তির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। Myth বলে, একজন জীবন্ত মানুষকে সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে সমাহিত করলে সে যখে পরিণত হয়ে নিদ্রাহীন প্রহরীর মত চিরকাল আগলে রাখে ঐ সঞ্চিত অর্থ। রবীন্দ্রনাথের সাধনা ভারতী পর্বের বিখ্যাত গল্প 'সম্পত্তি সমর্পণ' এ এই যখের Myth বা আর্কিটাইপের কথা রয়েছে। যজ্ঞনাথ কুণ্ড তাঁর জীবনের বহু কৃপণতার সঞ্চিত ধনকে আগলে রাখতে যখ প্রতিষ্ঠা করেন। কুড়িয়ে পাওয়া বালক নিতাইকে সযত্নে নিজের বাড়িতে রেখে একদিন তাকেই যখে পরিণত করার উদ্দেশ্যে জীবন্ত কবর দেন। অন্ধকার গহ্বরে নিতাইকে রেখেই উপরে ওঠার মইটি তুলে নেন। যক্ষের হাতে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সমর্পণ করে গর্তের মুখে মাটি চাপা দিতে দিতে যজ্ঞনাথ শুনতে পান "পৃথিবীর অতলস্পর্শ হইতে একটা ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে।"[২১] এরপর যজ্ঞনাথ যে কদিন জীবিত ছিলেন ততদিনই শুধু উদ্‌ভ্রান্তের মত সকলকে জিজ্ঞাসা করে বেড়ান "কান্না শুনিতে পাইতেছ?" অতি কৃপণ বৃদ্ধ যজ্ঞনাথ যখ করার নেশায় নিজের নাতিকেই যখ করে দিয়েছেন এই সত্য যেদিন জানা যায় সেদিন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। অবচেতন স্তরে চাপা পড়ে থাকে, তাই মৃত্যুর সময় চারদিক হাতড়ে বলেন; "নিতাই, আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে?"[২২] যজ্ঞনাথের নিজের চেতনাই একসময় যখে পরিণত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্পে যখের কাহিনি ব্যবহার করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন আধুনিক মানুষের জীবন যন্ত্রনার মূলে রয়েছে কিছু সংস্কার যাকে অতিক্রম করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেকটাই অসম্ভব। তাঁর গল্পে যজ্ঞনাথ কুণ্ড জীবিত কালেই ভয়ংকর পাপকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হন এবং শেষপর্যন্ত তারই অনুতপ্ত হৃদয়টি একসময় যখে পরিণত হয়, যেখান থেকে মুক্তির মইটি খুঁজে না পেয়ে জীবনের লুকোচুরি খেলায় অর্ন্তহিত হয়ে যান। ভিন্ন আদলে যখের ভাবনাকে সুবোধ ঘোষ রূপ দেন 'সমাহিত আর্তনাদ' গল্পে। এই রচনায় বহু অর্থের মালিক সুধন্য রায় একদিন মৃত্যু দেখে থমকে যান। তাঁর একমাত্র চিন্তা সারাজীবন ধরে যে অর্থ তিনি উপার্জন করেছেন তাঁর মৃত্যুর পর সেই উপার্জিত অর্থের কি হবে। দৈবজ্ঞের কাছে জানতে পারেন যখ প্রতিষ্ঠা করাই এর একমাত্র পথ। তাই এক দরিদ্র রাখাল বালককে ধরে নিয়ে আসেন। মাতৃবৎসল বালক রুগ্না মায়ের চিকিৎসার অর্থের বিনিময়ে সুধন্য রায়ের প্রস্তাবে সম্মতি দেয়। সে নিজেও জানে না এর পরিণাম কি ভয়ানক। নির্দিষ্ট লগ্নে বালকের কানে মন্ত্র প'ড়ে সুধন্য রায় তাকে যখে পরিণত করলেন। শেষ মুহূর্তে বালক তার ভয়ঙ্কর পরিণতির ইঙ্গিত পেয়ে যখন প্রচন্ড চীৎকার করে ওঠে তখন সুধন্য রায় দ্বারের কপাট বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু সুধন্য রায় শুনতে পান, "ভিতর থেকে ছোট ছোট দুটি দুর্বল হাতের আঘাত ছটফট করে বাজছে কপাটের বুকে। মনে হয় সুধন্য রায়ের, তাঁর

সঞ্চিত অর্থের জীবন্ত হৃৎপিন্ড শব্দ করে বাজছে। বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে, তাঁর এই সঞ্চিত অর্থের স্তূপ।"(৫৫৭ পৃ.) অর্থগৃধ্নু সুধন্য রায় উপলব্ধি করতে পারেন না জীবনের আনন্দের উৎস কি? মৃত্যুর পর ফিরে এসে তাঁর সঞ্চিত অর্থের ভোগ বাসনায় তিনি যখের ওপর দায়িত্ব দিয়ে প্রতীক্ষা করেন মৃত্যুর। একদিন অবধারিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন সুধন্য রায়। সাধারণের বিশ্বাস সুধন্য রায়ের ছায়াময় প্রেতশরীর লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দীঘির জলে, যেখানে তাঁর জীবিতকালের স্তূপীকৃত অর্থরাশির গুপ্ত ভান্ডারটি সুরক্ষিত। কিন্তু নিদ্রাহীন যখের আর্তনাদে সেই প্রেতমূর্তিও ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। সুবোধ ঘোষের গল্পটি সুধন্যরায়ের আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতেই পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং লোককথায় ঐ স্থানটিকে কেন্দ্র করে শোনা যায় কিছু জনরব। সুধন্য রায় তাঁর জীবিতকালের কৃতকর্মের কাছে পরাজিত হয়েই পালিয়ে বেড়ান মৃত্যুর পরও, তারই হিসাব রাখে কিংবদন্তী।

অর্থের প্রতি মোহ এবং অর্থলালসা এভাবেই মানুষকে জীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। 'হঠাৎ রাজার মণিঘর' গল্পে রাজা ধনী রায় এর পূর্বপুরুষ রাজা ছিলেন বটে কিন্তু বর্তমানে সেই ঐশ্চর্যের অভাবে ধনী রায় দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেন। কারণ জীবনে তার একমাত্র কামনা "ধনী হতে হবে। চাই সোনা, সত্যিকারের সোনা, রাজা হতে হবে, সত্যিকারের রাজা।"(৪১৩ পৃ.) - অসম্ভব অর্থলিপ্সার ফলে দস্যু ধনী রায় একদিন পরশপাথরের লোভে হত্যা করেন সন্ন্যাসীকে। পরশপাথরের গুণে লোহার স্তূপ পরিণত হয় সোনায়। ধনী রায় এর ব্যক্তিজীবন থেকে হারিয়ে যায় প্রকৃত ভালোবাসা। স্ত্রী মণিমালা মালতী কুঁড়ির মালা গলায় পরে স্বামীর ভালোবাসা প্রার্থনা করে, কিন্তু ধনী রায় রূপের মণিমালার পরিবর্তে প্রার্থনা করেন সোনার মণিমালাকে। সোনার স্তূপে সাজানো মণিঘরে মণিমালা নয় তার জীবনসঙ্গিনী করে সোনার তৈরী মণিমালার মূর্তিকে। সোনার নেশায় মণিমালার ভালোবাসাকে সম্পূর্ণ ভুলে যান ধনী রায়। নিয়তির কঠিন আঘাত এসে পড়ে ধনী রায়ের জীবনে। অর্থই যে অনর্থের মূল, সে অনর্থ ঘটতে চলেছে। নবাবের কাছে তাঁর ঐশ্চর্যের উৎস সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দেবার তলব এসেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে যাত্রাও করেছে ধনী রায়। পথশ্রমে ক্লান্ত ধনী রায় বিশ্রাম লাভের উদ্দেশ্যে বিলের কিনারায় এসে থামলে স্মরণে আসে তাঁর পূর্ব ইতিহাস। যেখানে সন্ন্যাসী একদিন তাকে আশীর্বাদ দিয়ে নৌকার পাটাতন সোনা করে দিয়েছিলেন এটিই সেই স্থান। হঠাৎই তাঁর সংকেত পারাবত খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে যায়। সংকেত পারাবতকে দেখতে পেয়ে ধনী রায়ের মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করে গড়ভবনের সকলে তার মণিঘরের সন্ধান পেয়ে যাবে এই আশঙ্কায় অশ্বচালনা করে ছুটে যান ধনী রায়। কিন্তু ততক্ষণে দীঘির জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে মণিমালা। স্বামীর মৃত্যুর সংকেত পেয়ে এক মুহূর্ত জীবন রাখতে পারেনি মণিমালা। স্বামীর প্রতি তার একান্ত ভালোবাসার পরিচয় পান ধনী রায়। তবুও তাঁর মণিঘরে এসে দাঁড়ান। এবারে যেন তাঁর সকল মোহ ঘুচে যায়। মণিমালার হুবহু প্রতিকৃতিকে কাছে নিয়ে ধনী রায় উপলব্ধি করেন এই মূর্তির 'হাসি নেই, অভিমান

নেই, আবেদন নেই' - শুধু দুটি কঠিন অধরে চেয়ে থাকে মণির মূর্তি। যেন তাঁর জীবনের স্পন্দনটিও পরশপাথরের ছোয়ায় কঠিন সোনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। সারা জীবন ধরে যে অর্থের পিছনে ছুটে বেড়িয়েছে সেই সোনার স্তূপ থেকে মুক্তি পেতে দীর্ঘিকার জলে ঝাঁপ দেন ধনী রায়, যেখানে তাঁর মণিমালা পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। জীবন থেকে বহুদূরে চলে গিয়ে ধনী রায় এবার রাজা হন।

অর্থলিপ্সা ও ধনগর্বান্ধতা মানুষের জীবনকে যে ভয়ংকর পরিণামের পথে নিয়ে যায় তার পরিচয় রয়েছে কয়েকটি রচনায়। 'দেবী উত্তরবাহিনী' গল্পে বিত্তবান বড় ভৌমিকের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন - "যে মানুষের অংগে সোনা রূপোর চিহ্ন নেই, সে মানুষকে দেখে প্রীতি লাভ করতে পারতেন না বড় ভৌমিক। নির্ধন রূপবানের মুখের দিকে তাকিয়ে কোন রূপ দেখতে পেতেন না তিনি। দরিদ্র বিদ্বানের বিদ্যার কোন মূল্য বুঝতে পারতেন না। বনের কোকিলের ডাক শুনে মুগ্ধ হতো না তাঁর মন, মুগ্ধ হয়ে শুনতেন তাঁর সোনার খাঁচার কোকিলের রব।"(পৃ.৩০) - কখনো কোনো অবস্থাতেই তিনি দরিদ্রকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে পারেন না। ধনাঢ্যের গৌরবে উৎসব তরণী আনন্দ বিতরণের জন্য ভেসে চলে শারদীয়া একাদশীতে। চাষীর মেয়ের মত দেখতে একটি মেয়ে তার ডাগরচক্ষু মেলে দুই হাত তুলে তরণীর মাঝিকে ডেকেছে। তরণী থেকে ভেসে আসা মৃদু গানের সুরে মোহিত হয়ে মেয়েটির ইচ্ছে জেগেছে গান শুনবে। দরিদ্র মেয়ের ডাকে নৌকা থামাতে দেননি বড় ভৌমিক। বরং ঘৃণাভরে যেন 'শখের করুণায় একটি মুদ্রা নিক্ষেপ করেন মেয়েটির দিকে।' আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে নেয় নদীর দিক থেকে। মুহূর্তে তুফান গর্জে ওঠে, বড় ভৌমিকের উৎসব তরণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। লোককথা বলে ধনের দেবী ধনাঢ্য বড় ভৌমিকের অহংকারকে সহ্য করতে না পেরেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। ধনাঢ্য গর্বান্ধের সকল অহংকারকে চূর্ণ করতেই দক্ষিণমুখিনী দেবী উত্তরবাহিনী হয়ে যান। বড়ভৌমিক মানুষকে যে অর্থের বিনিময়ে মূল্য দেন, এই মিথ্যে অহংকারের প্রমাণ দিতেই কিংবদন্তীটি গুরুত্বপূর্ণ।

মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রামের ইটের স্তূপের দিকে তাকিয়ে কিছু কল্পিত কাহিনি গড়ে উঠেছে 'সখি সোনার পাঠশালা' রচনায়। চারপাশে ইতিহাসের মাঝে মোগলমারি গ্রামের কয়েকটিমাত্র ইটের একটি স্তূপকে কেন্দ্র করে এই কিংবদন্তীর কোথাও কোন ইতিহাসের তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বলা হয় রাজা বিক্রমজিতের কন্যা সখিসোনা, কিন্তু বিক্রমজিৎ কোন্ সময়ের রাজা সে সর্ম্পকে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। রাজার মেয়ে সখিসোনা এবং কোটাল পুত্র অহিমানিক একই পাঠশালায় পড়তে গিয়ে দুজনেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কোটাল পুত্রকে নাম ধরে ডাকার অধিকার দিয়ে রাজকন্যা সখিসোনা সেই যুবকের নীরব ভালোবাসাকে স্বীকার করে নেয়। তারই মুখের 'সখী, সখিসোনা!' এই মিষ্টি ডাক শোনার আগ্রহে রাজপ্রাসাদের মোহ ত্যাগ করে অহিমানিকের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে সখিসোনা। তাদের মিলনকে ব্যর্থ করতে নানা কৌশল অবলম্বন করেন রাজা নরধ্বজ। এমনকি মায়াবিনীর যাদুজালে

বন্দী করা হয় অহিমানিককে। নরধ্বজের নানা প্রলোভনকে তুচ্ছ করে প্রণয়ীর জন্য অনন্ত প্রতীক্ষাতেও কোন ক্লান্তি নেই সখিসোনার। প্রণয় যুগলের এই অনন্ত প্রতীক্ষার জন্য সকল দুঃখবরণ দেখে খুশী হন নরধ্বজ। এরপর বহু প্রতীক্ষিত মিলনের ক্ষণ এসে উপস্থিত হয় তাদের জীবনে। অহির কণ্ঠে মধুর ডাক শোনার আনন্দটুকু পেতে সকল ক্লান্তিকে পেছনে ফেলে তারা মিলনের পথে যাত্রা করে। পেছনে পড়ে থাকে পাঠশালাটিও, যেখানে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের সূত্রপাত হয়েছিল। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে পাঠশালাটি, বেঁচে আছে সখিসোনা-অহিমানিকের প্রেম।

মেদিনীপুরের শালবনি অঞ্চলে ১৮০৬ খ্রীঃ বাগড়ি বিদ্রোহ হয়। অচল সিংহ এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন।[২৩] বহু প্রাণ বিনষ্ট করেও সরকার এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হননি। ইংরেজদের তোপের কাছে আত্মসমর্পন করে রাজা ছত্র সিংহ তাঁর চতুর বুদ্ধিতে সেনাপতি অচল সিংহকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেন। প্রাণদণ্ড হয় অচল সিংহের। 'গনগনির মাঠ' রচনায় ইতিহাসের এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'গনগনির মাঠ' যার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে আজও। বিশ্বাসহন্তা রাজার বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করতে না পেরে, অচল সিংহের ফাঁসির দড়িটির বেদনা সহ্য করতে না পেরে গনগনির মাঠের ঐ গাছটি পাথর হয়ে গিয়েছে। মহাভারতের দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম বকরাক্ষসের প্রাণ নিয়ে এই গনগনির মাঠে বীরত্বের প্রমাণ দিয়ে গেলেও, ইতিহাসের ছত্র সিংহ বীরত্বের পরিবর্তে বিশ্বাসহন্তার পরিচয়টিই বড় হয়ে উঠেছে, গনগনির মাঠ যার একমাত্র সাক্ষী।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির অঙ্গ ঢপ কীর্তনের প্রবর্তক, কবি ও গায়ক রূপচাঁদের জীবনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক কিংবদন্তী। তাঁর কণ্ঠের গান শান্তির প্রলেপ এনে দেয় সাধারণের জীবনে। এমনকি তাঁর সংস্পর্শে এসে দস্যুও তার দস্যুতাবৃত্তি ত্যাগ করে। মনে পড়ে যায় রামায়ণের রত্নাকর দস্যুর কথা, যিনি রামনাম জপ করে বাল্মীকি হতে পেরেছিলেন। কবি রূপচাঁদের কণ্ঠে 'ধৈরয ধর শ্যামপিয়ারী' গান শুনে পৃথিবীর যে কোন কান্না একমুহূর্তের জন্য হলেও থেমে যায়। মুক্তামালা নামের এক নারী তার জীবনের সকল দুঃখ ভুলে শান্তি পেতে চায়, রূপচাঁদের গান শুনে তাঁর শিষ্যা হয়ে যায় মুক্তামালা। মুক্তামালার জীবনের একমাত্র দুঃখ ভুলতে এই শিষ্যত্ব বরণ। সে ভালোবাসে নয়ানদাসকে, দস্যুবৃত্তি যার একমাত্র বৃত্তি। নয়ানদাসকে ভালোবাসলেও দস্যুর ঘরনি হতে সায় দেয়না মুক্তামালার মন। নয়ানদাস সম্পর্কে সবকিছু জানিয়ে হৃদয়ের ভার লাঘব করতে চায় মুক্তামালা। এদিকে রূপচাঁদকে ঘিরে মুক্তামালা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে নয়ানদাস। কিন্তু সকল ভুলের অবসান ঘটে, রূপচাঁদের সঙ্গে নয়ানদাসের সাক্ষাতে। রূপঠাকুরের গান শুনে নয়ানদাস তার দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কবির গানে দুটি প্রাণের প্রেম পরিপূর্ণতা পায়। এখানেই সুরস্রষ্টার জীবনের সার্থকতা। বর্ষপ্রাচীন যুগের কবি রূপচাঁদের ভিটেতে নীরবে নিভৃতে যেন সেই প্রেমময় ফুল ফুটে থাকে।

কি দস্যুর জীবন, কি সন্ন্যাস জীবন সকলের হৃদয়েই প্রেম আসে সূক্ষ্ম পদসঞ্চারে। 'দুর্গাকমল' শীর্ষক কাহিনিতে তরুণ সন্ন্যাসী কমলাকান্ত গোস্বামী নিজেই একসময় উপলব্ধি করেন অতিকঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার আড়ালে তার অন্তরে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে প্রণয়ভীরু কোন নায়িকার মৃদুহাস্য। এই মিথ্যা সন্ন্যাসব্রতের গর্বকে চূর্ণ করে দিতেই তাঁর জীবনে রাধারমণ মূর্তির আবির্ভাব। ঘন অরণ্যে গভীর নিশীথে একদল দস্যুকে লুণ্ঠন করে ফেরার পথে পিপার্সাত হয়ে জলকুন্ডের সন্ধান করতে দেখে কমলাকান্ত তাঁর কমন্ডলু থেকে জলদান করেন। যোগীবরের যোগসিদ্ধিতে ক্ষুদ্র কমন্ডলুর জল পিপাসিতের হৃদয়কে তৃপ্ত করে। তারা সন্তুষ্ট হয়ে যোগীবরকে একটি দেবমূর্তি উপহার দেয়। পরদিন প্রভাতের আলোয় কমলাকান্ত দেখতে পান এই মূর্তি একটি রাধারমণ মূর্তি, যার লীলাময় রূপ দর্শনে যোগীর অন্তরের সুপ্ত প্রেম জেগে ওঠে। সেই প্রেমের পরিপূর্ণতা ঘটে জয়দিয়ার রাজা মুকুট রায়ের কন্যা দুর্গাবতীকে ঘিরে। কমলাকান্তের সন্ন্যাসজীবনে একদিকে রাধারমণ মূর্তি, অন্যদিকে দুর্গাবতী দুইয়ের সম্মিলনে সন্ন্যাস জীবনের সকল ভণ্ডামি ঘুচে যায়। প্রেমের পুরুষ রাধারমণের সকল ভার দুর্গাবতীর হাতে সঁপে দিয়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হন কমলাকান্ত, সেদিন দুর্গাবতী তার প্রেমের নিগড়ে বন্দী করে কমলাকান্তকে। একদিন ঐ বনভূমিকে আলোকিত করে তাদের বিবাহোৎসবের প্রদীপ জ্বলে ওঠে। শিলালিপি বলে, তাদের ঐ পর্ণকুটীরেই রাধারমণ মন্দির স্থাপিত হয় এবং পরবর্তীকালে ঐ গ্রামের নামকরণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দুটি প্রেমিক হৃদয়; গোস্বামী-দুর্গাপুর গ্রামটি সেই নশ্বর মানুষের কীর্তিকেই বহন করে চলেছে আজও। সেইসব কীর্তির নিদর্শনেই সাধারণ মানুষ গল্প রচনা করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। তাইতো রাজকুমারী দুর্গাবতী ও সন্ন্যাসী কমলাকান্তের দুটি হৃদয় অবলীলায় মিশে যেতে পারে মানুষের কল্পনায়, কারণ তাদের মিলনের একমাত্র সেতু যে প্রেমের সম্পর্কে বাধা।

প্রেম ও ক্ষমা মানব জীবনের দুটি প্রধান গুণ। 'নীলাম্বরের রাজপাট' শীর্ষক রচনায় দ্বিতীয় গুণটির মহিমা প্রচারিত হয়েছে। ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে, কামতা রাজ্যের একশ বছরের স্বাধীনতা খর্ব করেছে গৌড় সুলতান হুসেন শাহ। স্বাধীন কামতা রাজ্যের শেষ রাজা নীলাম্বর বিচারসভায় তাঁর মন্ত্রীর পুত্রকে বধের আদেশ দেন, কারণ সে তাঁর রানির প্রতি অবৈধ আসক্তি প্রকাশ করেছিল। তাকে বধ করে তিনি মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে তার মাংস খাইয়েছিলেন; তখন তার পিতা প্রতিশোধ নিতে গঙ্গাস্নানের অছিলায় গৌড়ে চলে আসেন এবং হোসেন শাহকে কামতাপুর আক্রমণের জন্য উত্তেজিতকরেন। হোসেন শাহ তখন কামতাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু নীলাম্বর তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করেন। অবশেষে হোসেন শাহ মিথ্যে করে নীলাম্বরকে বলে পাঠান যে তিনি চলে যেতে চান, কিন্তু যাবার আগে তাঁর বেগম একবার নীলাম্বরের রানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান; নীলাম্বর তাতে সম্মত হলে হোসেন শাহের শিবির থেকে তাঁর রাজধানীর ভিতরে পালকী যায়, তাতে নারীর ছদ্মবেশে সৈন্য ছিল; তারা কামতাপুর নগর অধিকার করে;[২৪] ১৪৯৮-

৯৯খ্রীঃ এর এই ঘটনার জের কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। হুসেন শাহের কামতা রাজ্য অধিকার ইতিহাস হলেও মন্ত্রীপত্নী ক্ষেমা দেবী ইতিহাসে উপেক্ষিত। সুলতান হুসেন শাহের সঙ্গে জোটবদ্ধ শচীপাত্র নীলাম্বরের ওপর প্রতিশোধ স্পৃহায় জেগে উঠলে ক্ষেমা দেবী বিচলিত কণ্ঠে বলেন - "রাজা নীলাম্বরের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কামতাপুরের স্বাধীনতা আর সম্মানকে এমন ক'রে মাটিতে লুটিয়ে দেবেন না স্বামী।"(পৃ. ৪২১) - ক্ষেমা দেবীর কোন আপত্তি শোনেননি ক্রোধোন্মত্ত শচীপাত্র। বরং ক্ষেমা দেবীকেই হুসেন শাহের বেগমের ছদ্মবেশে পাঠানো হল, নীলাম্বর স্মরণে আনার চেষ্টা করেন, 'দেবীচক্ষুর মত স্নিগ্ধায়ত ও মমতা কোমল চক্ষু দুটি' কার? সেখানেই তিনি গৌড় সৈনিকের হাতে বন্দী হলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ নীলাম্বর দেবী কামদার কাছে প্রার্থনা করেন একবার মুক্ত হতে। সেই প্রার্থনায় সাড়া দিয়েই যেন ক্ষেমা দেবী এলেন। পুত্রহন্তাকে ক্ষমা করার এরকম ঘটনা বিরল। তবু ক্ষেমা দেবী বলেন - "এক পুত্র শোকের শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু আর এক পুত্র শোকের শাস্তি পেতে চাই না।"(৪২২ পৃ.) ক্ষেমা দেবী রাজাকে হৃতরাজ্য উদ্ধারের আদেশ দেন। কিন্তু রাজা নীলাম্বর ক্ষেমাদেবীকেই রাজপাটের সর্বাধীশ্বরী জেনে সংসার ছেড়ে বিবাগী হন। অন্যদিকে গৌড় সুলতানও চেয়েছিলেন ক্ষেমা দেবীই কামতাপুর রাজপাটের ভার গ্রহণ করুন। কিন্তু ক্ষেমা দেবী কামদাকেই অধিশ্বরী জেনে কামদা মন্দিরের গোস্বামিনী হয়ে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। লোকমুখে প্রচলিত হতে হতে এই গোস্বামিনী থেকেই দেবী কামদার নাম হয়েছে গোসানী দেবী এবং অঞ্চলটির নাম গোসানিমারি। 'নীলাম্বরের রাজপাট' কাহিনি অংশটি মূলত কোচবিহার জেলার দিনহাটার কাছে অবস্থিত গোসানিমারি অঞ্চলের লোকশ্রুতি। প্রতিহিংসা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে মাতৃকামূর্তিরই ক্ষেমা দেবী। পুত্র হন্তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনেই ক্ষেমা দেবী যেন পৌঁছে গেছেন মানবিক সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতার ঊর্ধ্বে এক দেবীতায়।

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী তিন পুন্যসলিলা যুক্তবেনী পরিচিত হয়েছে ত্রিবেনী নামে। ত্রিবেনীর মহাশ্মশানের বুকের ওপর জেগে রয়েছে এক সম্পর্ক, গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা। পণ্ডিত জগন্নাথের সঙ্গে ভোলানাথ কণ্ঠাভরণের বিতর্কে পরাজিত জগন্নাথের মিথ্যে অহংকার চূর্ণ হয়ে যায়। পরাজিত পণ্ডিত তাঁর হৃত গৌরবকে সহ্য করতে পারেন না। সেদিনই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ভৃত্য রামদাসকে শিষ্যরূপে বরণ করে তারই কাছ থেকে গুরুদক্ষিণার প্রতিশ্রুতি নেন। শিষ্য রামদাস প্রতিশ্রুতিমত জগন্নাথ পন্ডিতের পুত্রকে শবসাধনা করায়। এমনকি গুরুপুত্রের শবসাধনার জন্য যেদিন সত্যিকারের শবের প্রয়োজন হয় সেদিন নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে বলিষ্ঠ বাহুবলে নিজেকে নিষ্প্রাণ করে গুরুপুত্রের শবসাধনায় সিদ্ধি এনে দেয়। রামদাসের শবের ওপর গুরু পুত্রের শবসাধনা সার্থক হয়। গুরুকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি নির্মমভাবে পালন করে গুরুদক্ষিণা দেয় রামদাস। ত্রিবেনীর মহাশ্মশানে অমারাত্রির তৃতীয় প্রহরে আজও জেগে ওঠে শুকতারা। মনে হয়, এক শিষ্যের ভয়ংকর আত্মোৎসর্গের একমাত্র সাক্ষী এই শুকতারা শ্মশানভূমির

দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে।

সুবোধ ঘোষের রচনায় প্রচলিত জনশ্রুতি, কখনো কিংবদন্তী বা প্রাচীন ধারাকে অবলম্বন, কখনো Mythology কে অবলম্বন করে গল্প রচনা আবার কখনো বা প্রকৃত ও আধুনিক অর্থে যে ছোটগল্প সেই ধারার রচনা লক্ষ্য করা যায়। একই সঙ্গে গল্পকারের মধ্যে এই ভিন্ন দিকগুলি তাঁর হয়ে ওঠারই কোনো একটা দিক। কিংবদন্তীর মধ্যে পাঠক ভিন্নধর্মী ছোট গল্পের রস পান। যদিও ছোটগল্প ও কিংবদন্তী বিষয়গত ও আঙ্গিকগত দিক থেকে দুটি স্বতন্ত্র ধারা। ছোটগল্পে আধুনিক মানুষের মনোজগৎকে চিড়ে ফেলে জীবনযন্ত্রণা ও জীবনজটিলতা দেখানো হয়, কিংবদন্তী সেই জটিলতা বা জীবনযন্ত্রণা প্রকাশ না করলেও মানবতার এক একটি দিককেই তুলে আনে যা চিরন্তন। আর একারণেই কিংবদন্তীর গল্পকাহিনি আধুনিক কালের পাঠকের হৃদয়কেও স্পর্শ করে। ছোটগল্পের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আমরা যে বীজগুলিকে লক্ষ্য করি তারই একটি ধারা কিংবদন্তী। এমনকি বাংলা ছোটগল্পের সার্থক রূপকার রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা' গল্পের মূলেও রয়েছে কিছু জনশ্রুতি বা কিংবদন্তী। কিন্তু ছোটগল্প ও কিংবদন্তী এক নয়। সেকারণেই ছোটগল্প থেকে বিষয়টিকে আলাদা করে আলোচনার অবকাশ থাকে। কিংবদন্তীর এক একটি কাহিনি দেশ ও জাতির ইতিহাসকে জীবন্ত করে রেখেছে। রূপকথার মত অদ্ভুত জীবন নয়, আবার উপকথার মত নিছক কাল্পনিকতা নয়, কিংবদন্তীর ঘটনাস্থল মানুষের চোখে দেখা, চোখে দেখা কাহিনির মধ্যে খোঁজা হয় ঐতিহাসিক চরিত্রের ইতিহাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ব্যক্তিজীবনের কোন বিষাদময় পরিণতি। আসলে লিখিত ইতিহাস যেখানে এসে নীরব হয়, কিংবদন্তীর যাত্রা সেখান থেকেই। ইতিহাসের কাছে সমাজ, ধর্ম, সংস্কার প্রভৃতি তার বেড়া অতিক্রম করতে পারে না। সেই সব সংস্কারের বেড়া ভেঙ্গে বিশ্বমানবতার সুর কিংবদন্তীগুলির মূল কথা। ধর্মের মধ্যবর্তী প্রাচীর অতিক্রম করে হৃদয়ানুভবের পরিচয় দেয় এই কাহিনিগুলি। 'ফুলজানি-নামা' রচনায় হিন্দু-মুসলিম জাতির সমন্বয় সাধিত হয়েছে বিবাহের মধ্য দিয়ে। ইতিহাস কিন্তু এই মিলনকে মূল্য দেয় না, কিন্তু কিংবদন্তী স্বীকার করে জাতিভেদের ঊর্ধ্বে এক মানবতাকে। 'মূর্ছা পাহাড়ের কথা' গল্পে ষোড়শ শতাব্দীর প্রেমভক্তি আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে। নবজাগরণের প্রাণপুরুষ চৈতন্যদেব বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে বড় করে দেখেছিলেন, তাঁরই অমৃতময় জীবনের কাহিনি শুনে বীর হাম্বীর মূর্ছিত হন। বিধর্মীজাতির বিজাতীয় গ্রন্থের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ইতিহাসে স্বীকৃত নয়, তার যথাযথ মূল্য দেয় কিংবদন্তী। বাংলাদেশের ইতিহাস বর্ষপ্রাচীন কাল ধরে লিখিত তথ্যকে বহন করে চলেছে। ইতিহাসের ধর্ম মানুষকে মূল্য দেয়নি, মূল্য দিয়েছে কিংবদন্তী। হিন্দু-মুসলিম ইংরেজ-পর্তুগীজ প্রভৃতি ধর্ম সমন্বয়ের ঐক্যভূমি বাংলাদেশের কিংবদন্তীগুলি ছোট ছোট গল্প আকারে জীবনের সত্যকে প্রকাশ করে। সুবোধ ঘোষের রচিত কিংবদন্তীগুলি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। ঐতিহাসিক চরিত্রের বীরত্ব, প্রতাপ এর আড়ালেও যে অশ্রুধারা অবিরল ধারায় বর্ষিত হয়েছে তার সন্ধান দিতে সক্ষম শুধুমাত্র কিংবদন্তী। বাংলা সাহিত্যে এই শাখার অদ্বিতীয় লেখক সুবোধ

ঘোষ 'কিংবদন্তীর দেশ' এর কাহিনিগুলি পরিবেশনে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসের পরিবেশকে সত্য করে তুলতে লেখকের ভাষা ব্যবহার অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় রাখে। 'গণেশ জননীর আবির্ভাব' গল্পের অংশ বিশেষ উল্লেখ করলেই বোঝা যায় কত সহজে অতীতের ঘটনাকে চিরন্তন করে তোলেন - "ছিন্নমৃণাল পদ্ম পুষ্পের মত সেই শিশুর দেহ তরঙ্গের প্রবাহ ভঙ্গে তাড়িত হয়ে তটভূমির উপর এসে লুটিয়ে পড়ে। উন্মাদিনী মাতা ছুটে এসে কুড়িয়ে নেয় তার সন্তানকে। চুম্বনে চুম্বনে উত্তপ্ত করে তোলে শিশুর দুই সিক্ত ওষ্ঠ - কিশলয়। কেঁদে ওঠে শিশু এবং সেই প্রাণময় ক্রন্দনকে বুকের উপর নিবিড় আগ্রহে চেপে ধ'রে পীযুষস্নিগ্ধ সান্ত্বনা দান করেন জয়িনী মানব মাতার মত ভঙ্গী নিয়ে রাজা প্রদ্যুম্নের ভ্রাতৃজায়া ইন্দুমতী।"(পৃ.৪০৯) চারশ বছরের শুধু নয় অষ্টম শতাব্দীর ইতিহাস (কহ কৌশিকী) ও তাঁর কলমের আচড়ে জীবন্ত রূপে ধরা দেয় এবং মানবজীবনের চিরকালীন গল্প পিপাসা চরিতার্থ হয়। কারণ ইতিহাস 'সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবনব্যাখ্যা'[২৫] হলেও 'সাহিত্য চিরন্তন এক জীবন তুলে আনে'[২৬] গল্পকার সুবোধ ঘোষ সেই ইতিহাসকে অবলম্বন করে চিরন্তন মানুষেরই জীবনকে ব্যাখ্যা করেন নানা বীক্ষণ থেকে। মহাভারতের আখ্যানকে অবলম্বন করে একসময় তিনি আধুনিক চরিত্রের জীবন ব্যাখ্যায় মনোযোগী ছিলেন, তেমনি সুদূর ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণেই তিনি ইতিহাসের অতলে ডুব দিয়ে ঝিনুক কুড়িয়ে এনেছেন। যেসব ঝিনুকের ক্ষুরধারে অতীত ইতিহাসের উপেক্ষিত চরিত্র ও ঘটনা তার শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। অতীতের মানুষগুলিও তার অন্তরাল থেকে বেড়িয়ে এসে আধুনিক মানুষের জীবন ভাবনার সঙ্গে সমান্তরালে পদচারণা করে। আর এখানেই সুবোধ ঘোষের 'কিংবদন্তীর দেশে' আধুনিক পাঠকেরও মর্মগ্রাহী হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র

১। সাহিত্যে ছোটগল্প / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স / ১ম সংস্করণ শ্রাবণ ১৮০৫/পৃ.১৫

২। The Penguin Dictionary of Literary terms and Literary theory / J.A. Cuddon / Third Edition.

৩। তদেব।

৪। তদেব।

৫। 'ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র' / শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় / আনন্দ পাবলিশার্স/প্রথম সংস্করণ - জানুয়ারি ১৯৯৮।

৬। বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)/রমেশচন্দ্র মজুমদার/জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লি./চতুর্থ সংস্করণ-১৯৮৭।

৭। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) ১ম খণ্ড/নীহারঞ্জন রায়/পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি/১৯৮০।

৮। বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড/রমেশচন্দ্র মজুমদার/জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রা.লি./চতুর্থ সং - ১৯৮৭।

৯। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন/ডঃ অতুল সুর/সাহিত্যলোক/৩ য় সং. - ২০০১।

১০। তদেব।

১১। তদেব।

১২। বাংলা দেশের ইতিহাস/২য়খণ্ড/রমেশচন্দ্র মজুমদার/জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রা.লি./চতুর্থ সং - ১৯৮৭।

১৩। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন / ডঃ অতুল সুর / সাহিত্যলোক / ৩য় সং. - ২০০১।

১৪। বাংলা দেশের ইতিহাস / ২য় খণ্ড / রমেশচন্দ্র মজুমদার / জেনারেল প্রি.য়্যা.পা. প্রা. লি./ ১৯৮৭।

১৫। 'দেবতার গ্রাস'/'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থ/রবীন্দ্ররচনাবলী চতুর্থ খণ্ড/বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ/বৈশাখ ১৪০৯।

১৬। তদেব।

১৭। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন / ডঃ অতুল সুর / সাহিত্যলোক / ৩য় সং. ২০০১।

১৮। তদেব।

১৯। বাংলা দেশের ইতিহাস/২য় খণ্ড/রমেশচন্দ্র মজুমদার/জেনারেল প্রি.য়্যা.পা.প্রা.লি./২য় সং. মাঘ ১৩৮১।

২০। বাংলা দেশের ইতিহাস/৩য় খণ্ড/রমেশচন্দ্র মজুমদার/জেনারেল প্রি.য়্যা.পা. প্রা. লি / ২য় সংস্করণ মাঘ, ১৩৮১।

২১। 'সম্পত্তি সমর্পণ'/রবীন্দ্র রচনাবলী/৮ম খণ্ড/বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ/বৈশাখ ১৪০৯।

২২। তদেব।

২৩। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন / ডঃ অতুল সুর / সাহিত্যলোক / ৩য় সং. ২০০১।

২৪। বাংলা দেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড/রমেশচন্দ্র মজুমদার/জেনারেল / ২য় সং. মাঘ - ১৩৮১।

২৫। 'ইতিহাস ও সাহিত্য'/প্রবন্ধ সমগ্র / অশীন দাশগুপ্ত / আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি./১ম প্রকাশ, জানুয়ারি - ২০০১।

২৬। তদেব।

২৭। এই অধ্যায়ে আলোচিত সুবোধ ঘোষের গ্রন্থ নাম ঃ -

ক। 'কিংবদন্তীর দেশে', ভূমিকা / সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র / ১ম খণ্ড/নাথ ব্রাদার্স/১ম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮/ পৃ. ৪০২-৪০৬।

খ। 'কহ কৌশিকী'/কিংবদন্তীর দেশে /A collection of semi histrical Legends by Subodh Ghosh / পৃ. ১৪-২১।

গ।'মহীপালের দীঘি'/সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র/২য়খণ্ড/নাথ ব্রাদার্স/১ম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯/পৃ. ৪৯০-৪৯৪।

ঘ। 'ফুলজানি নামা' / তদেব / পৃ. ৫০০-৫০৫।

ঙ। 'লও ফিরে তব পুরস্কার' / A collection of Semi historical Legends by Subodh Ghosh / পৃ. ৫৯-৬৫।

চ। 'মূর্ছা পাহাড়ের কথা'/তদেব/পৃ. ৮৪-৯০।

ছ। 'ভক্ত মর্তুজা'/সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র/৪র্থ খণ্ড / নাথ ব্রাদার্স/জানু. ২০০০/পৃ. ৪০৪-৪০৮।

জ। 'ধার্মিক দাক্রুজ'/সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র/৩য় খণ্ড/নাথ ব্রাদার্স/১ম প্রকাশ জানু. ১৯৯৯/পৃ. ৫৪৪-৫৪৮।

ঝ। 'একটি স্বপ্নের আহ্বান'/তদেব/৫ম খণ্ড/নাথ ব্রাদার্স/১ম প্রকাশ এপ্রিল ২০০১/পৃ. ৪০৪-৪০৬।

ঞ। 'শরৎখানার দহ'/তদেব/১ম খণ্ড / নাথ ব্রাদার্স/জানু. ১৯৯৮/পৃ. ৪২৩-৪২৭।

ট। 'পতিঘাতিনী সতী'/তদেব/৫ম খণ্ড/নাথ ব্রাদার্স/১ম প্রকাশ এপ্রিল ২০০১/পৃ. ৪১০-৪১৬।

ঠ। 'মেহের হামারা'/Kimbadantir Deshee/A collection of semi historical legends by Subodh Ghosh/পৃ. ৩০৩-৩০৮।

ড। 'গনেশজননীর আবির্ভাব'/সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র / ১ম খণ্ড/নাথ ব্রাদার্স/জানু. ১৯৯৮/পৃ. ৪০৭-৪১২।

ঢ। 'লীলা ও চারণক'/তদেব/৩য় খণ্ড/তদেব/১ম প্রকাশ জানু. ১৯৯৯/পৃ. ৫৪৮-৫৫৩।

ণ। 'একটি বুলবুলের শিস'/Kimbadantir Deshee/A collection of semi historical legends by Subodh Ghosh /পৃ. ২৭৩-২৮০।

ত। 'মধুমঞ্জরীর চোখের জল'/সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র/৫ম খণ্ড/নাথ ব্রাদার্স/১ম প্রকাশ এপ্রিল ২০০১/পৃ. ৪০৭-৪১০।

থ। 'রানী রায়বাঘিনী'/তদেব/২য় খণ্ড/তদেব/১ম প্রকাশ জানু. ১৯৯৯/পৃ. ৪৯৫-৪৯৯।

দ। 'রানী শিরোমণি'/তদেব/১ম খণ্ড/তদেব/জানু. ১৯৯৮/পৃ. ৪১২-৪১৭।

ধ। 'সবিতার দাসী সাবিত্রী'/তদেব/৪র্থ খণ্ড/তদেব/জানু. ২০০০/পৃ. ৪০১ - ৪০৩।

ন। 'ডুমনীতলার মা'/Kimbadantir Deshee/A collection of semi historical legends by Subodh Ghosh / পৃ. ১৪২-১৪৫।

প। 'পুন্ড্রবর্ধনের নর্তকী'/তদেব/পৃ. ৯১-৯৮।

ফ। 'সনকা ও মেনকা'/সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র/২য় খণ্ড/নাথ ব্রার্দাস/জানু. ১৯৯৯/পৃ. ৫০৬-৫১১।

ব। সমাহিত আর্তনাদ/তদেব/৩য় খণ্ড/তদেব/১ম প্রকাশ জান. ১৯৯৯/পৃ. ৫৫৩-৫৫৮।

ভ।'হঠাৎ রাজার মণিঘর'/তদেব/৪র্থ খণ্ড/তদেব / জানু. ২০০০/পৃ. ৪১২-৪১৮।

ম। 'দেবী উত্তরবাহিনী'/Kimbadantir Deshee/A collection of semi historical legends by Subodh Ghosh /পৃ. ২৯-৩৫।

য। 'সখিসোনার পাঠশালা'/তদেব/পৃ. ২২-২৮।

র। 'গণগণির মাঠ'/সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র/৪র্থ খণ্ড/নাথ ব্রাদার্স/জানু. ২০০০/পৃ. ৪০৮-৪১২।

ল। 'কবি রূপঠাকুর'/তদেব/৩য় খণ্ড/তদেব/জানু. ১৯৯৯/পৃ. ৫৫৮-৫৬৩।

শ। 'দুর্গাকমল'/তদেব/৫ম খণ্ড/তদেব/এপ্রিল ২০০১/পৃ. ৪১৬-৪২০।

ষ। 'নীলাম্বরের রাজপার্ট/তদেব/১ম খণ্ড/তদেব/জানু. ১৯৯৮/পৃ. ৪১৭-৪২৩।

স। 'গুরুদক্ষিণা'/Kimbadantir Deshee/A collection of semi historical legends by Subodh Ghosh /পৃ. ৬৬-৭৩।